KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৺ সরস্বতী সমসুন্দরী (ছুমর, কম- ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দু (সমরজিৎ
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5 "/ 8.5 "
Vol. & Number : Award Issue 6/3 6/4 7/2	Year of Publication : April 1983 April - June 1983 July - Feb 1983 May 1984
	Condition : Brittle / Good
Editor : সমরেন্দু (সমরজিৎ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

২৪

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বৈশাখ ১৩৯১
বিভাব

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ এবং করুণা প্রিণ্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

নাইনটিন এইটিফোর : জর্জ অরওয়েলের বিশ্বদর্শন

দীপক রুদ্র

বিংশ শতাব্দীর সেই প্রান্তিক বছরটি এসে গেল, যার আতঙ্কিত পূর্বাভাস প্রায় চার দশক আগে রেখে গেছেন জর্জ অরওয়েল ছদ্মনামধারী ইংরাজী সাহিত্যের এক অসামান্য রহস্যপুরুষ। গত দু-তিন মাস ধরে দেশে বিদেশে অরওয়েলের ভবিষ্যৎবাণী ও বিশ্বদর্শন নিয়ে আবার বিস্তর আলোচনা সমীক্ষা হচ্ছে, এবং স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি, রচনার তাৎপর্য ইত্যাদি নিয়ে বিতর্কও উঠেছে নতুন করে। আমরা জানি যে অরওয়েলের প্রকৃত নাম ছিল এরিক আর্থার ব্লেয়ার, তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯০৩ সালে উত্তর বিহারের মতিহারি শহরে, তিনি ১৯২২ থেকে ১৯২৭ অবধি ব্রহ্মদেশে পুলিশ অফিসার ছিলেন, তিরিশের দশকে তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কোবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়তে, এবং অন্যান্য বিচিত্র অন্বেষণের মধ্যে যুদ্ধকালীন বি. বি. সি.'র পূর্বদেশীয় শাখায় তিনি মুলক রাজ আনন্দ ও টি. এস. এলিয়টের সহকর্মীও ছিলেন। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়রোগে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু অরওয়েলের তথাকথিত ভবিষ্যৎদর্শন—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও 'পরিচালিত' একটি বিশ্বসমাজ, কেন্দ্রায়িত স্বৈরতন্ত্রে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমগ্র মানসমূহের বিকৃতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তি—এই নিয়ে আলোচনা নয়। বরং লেখকের মনে কোন্ বিবর্তনের ফলে এই বিশ্বাস জন্মেছিল, তার সূত্রনির্দেশ ও উপস্থাপনা।

শুরুতেই মনে রাখা দরকার যে 'রাজনৈতিক' লেখক হিসাবে অরওয়েলের

প্রভাব প্রধানত মরণোত্তর—এই প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে গণতান্ত্রিক কিছু চিরন্তন বৃত্তির ব্যবহারিক প্রয়োগে, স্বাধীনতাবোধে ও এমন এক সহনশীলতায় যা পরস্পরবিরোধী মতের সার ও যাথার্থ্য যাচাই করে পাওয়া, অবজ্ঞা বা নির্লিপ্ততায় নয়। সুইফ্‌ট ও জনসনের মতো "টোরি এনার্কিস্ট" রূপে অরওয়েলের রাজনৈতিক সত্তার প্রাথমিক প্রকাশ—পরে সোস্যালিস্ট হয়ে তিনি চিরকালীন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রের—সমতা স্বাধীনতার—প্রবক্তা হলেন, যেমন তাঁর আগে ও পরে ছিলেন উইলিয়ম মরিস, ব্ল্যাচফোর্ড, টনি, কোল, লাস্‌কি ও বেভান।

রাজনৈতিক যে তর্কস্থিতির তিনি প্রতিভূ, তাতে স্বাধীনভাবে গৃহীত মূল্যবোধই কেন্দ্রীয়; মার্কসীয় চিন্তার গঠনমূলক কাঠিণ্য তাতে নেহাৎই প্রান্তস্থায়ী। অরওয়েলের চোখে দলছুট সোস্যালিস্টরা ছিলেন ঘৃণ্য, এবং কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁর ক্রোধের আসল কারণ, তাঁরা স্বৈরী হয়ে গেছেন—মানুষের জীবনকে তাঁরা অবাধ খরচের সামগ্রী ভাবেন, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন।

অনেকের ধারণা—এমন কি অরওয়েলের শেষের দিকের প্রকাশক ওয়ার-বার্গেরও ধারনা--যে তিনি Animal Farm বা Nineteen Eighty Four লেখার সময় এই নৈতিক ভিত্তিটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এ ধারণা দৃশ্যতই ভুল। অরওয়েলের সারা লেখক জীবনের তাড়না ছিল তাঁর নিজের দলের আভ্যন্তরীণ সততা ও চিন্তা-কাজের সমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া—যদিও তাঁর "নিজের বেড়ালের লোম উলটে ঘসা"র প্রবণতা পুরোনো সহযাত্রী (যথা রেমণ্ড উইলিয়ম্‌স ও আইসাক ডয়েট্‌সার) অনেককেই সন্দেহে ফেলেছিল। শেষ অর্থে তিনি জ্যাকোবিনই ছিলেন হয়তো, জন স্টুয়ার্ট মিলের মতাবলম্বী ছিলেন না।

অরওয়েল অবশ্য উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক লেখকই শুধু ছিলেন, এমন নয়—তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কবি, সমালোচক ও শ্রুতিধরও ছিলেন বিলক্ষণ। এ-কথাও স্পষ্ট যে অরওয়েলের সাহিত্যিকও রাজনৈতিক বিকাশ শুরু হয়েছিল একটু দেরিতেই। তাঁর প্রথম পর্যায়ের বইগুলিতে (Burmese Days, The Road to Wigan Pier বা Down and Out in London and Paris) ধনতান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক স্বৈরাচার, অবিচার, অসমতা ও অত্যাচারের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রকট হলেও কোনো স্থির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত

লেখকের বর্ণনাশ্রয়ী বিবরণে দেখা যায় না। অরওয়েল যেন আত্মশুদ্ধিতেই মগ্ন এই সময়কার লেখায়। অন্যত্র, 'A Clergyman's Daughter' ও 'Keep the Aspidistra Flying'-এর মতো উপন্যাস (ততদিনে তিনি হ্যাম্পস্টেডের 'intellectual and social borderland'-এ পৌঁছে গেছেন) সাধারণ মানুষের অব্যর্থ সৌজন্য ও দুর্বলতায় যেমন উজ্জ্বল, তেমনই ঋজু ভবিষ্যতের সমাজচিন্তায়। অরওয়েল common man-এর কাছে বেশি প্রত্যাশা করতেন না কখনও—তাঁর বিশেষ ক্ষোভ ও রাগ রক্ষিত ছিল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য, যাঁরা (অরওয়েলের মতে) প্রগতিবাদী উদারচিত্ত সেজেও স্বভাবে আচরণে দ্বিচারী ও কপট। উদাহরণ স্বরূপ, অরওয়েল এজরা পাউণ্ডের সাহিত্যিক উৎকর্ষের তারিফ করেছেন যেমন, তেমনি তাঁর ইহুদীবিরোধ ও জাতিঘৃণাকে নির্দ্বিধায় নিন্দাও করেছেন। সেই সময়ের বর্দ্ধমান আন্তর্জাতীয়-তার পরিমণ্ডলে অরওয়েলের দেশপ্রেম আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। চার্টিস্ট সম্প্রদায় ও জন লকের মতো অরওয়েলও বিশ্বাস করতেন যে তাঁর দেশের প্রকৃত অধিকারী সাধারণ মানুষ, তথাকথিত ভদ্রলোক (gentry) বা উঁচু শ্রেণীর অধিবাসী নন, বুদ্ধিজীবীও নন যাঁরা সহজ ও অগভীর আন্তর্জাতীয়তায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছেন। তিনি সযত্নে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে তফাৎ টেনেছেন--কৃত্রিম বিভেদসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর হিংস্র বিরোধ সত্ত্বেও। নিছক জাতীয়তাবাদকে অরওয়েল অহঙ্কারের সামিল মনে করতেন, যেমন তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'Burmese Days' বা 'Notes onNationalism'-এ। অথচ, তিনি তাঁর নিজের ইংরাজ সত্তায় নিশ্চিন্ত ছিলেন বলেই এমন অক্লেশে ইংরাজ জাতির অবনতি ও স্বার্থপরতা, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের ধ্বংস ও অপচয়ের কঠোরতম সমালোচনা করেছেন, এবং একই সঙ্গে প্রকৃত ইংরাজ অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও নান্দনিক স্থিরতায় আনন্দ ও বিশ্বাস বজায় রাখতে পেরেছেন। তাঁর এই পর্যায়ের বই 'The Lion and the Unicorn' বা 'The English People' উইন্সটন চার্চিল, আর্থার ব্রায়ান্ট বা এ. এল. রাউসের তুলনীয় রচনার চেয়ে নিঃসন্দেহে উন্নতমানের।

আরেকদিক থেকে অরওয়েল ইংরাজী সাহিত্যধারায় অনন্য—তিনিই সম্ভবত প্রথম বুদ্ধিজীবী লেখক যিনি তাঁর নিজের তাত্ত্বিক কল্পনা ও চিন্তাকে বিসর্জন না দিয়েও সামাজিক তথা ব্যবহারিক প্রশ্নে জোরালো, activist বক্তব্য রাখতে পিছুপা হননি। আবার অডেনের কথাতেই আসা যাক--'Inside

the Whale'-এ অরওয়েল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অডেনের লোক-দেখানো ছেলে-ভোলানো রাগকে বিদ্রূপ করেছেন, বিশেষত কলাচর্চায় তাঁর আন্তরিকতা ও বোধের প্রেক্ষিতে। অরওয়েলের জীবনীকার বার্গার্ড ক্রিকের মতে, পারস্পরিক গ্রীক-রোমক সভ্যতার মূলে নাগরিকত্ব ও কৃষ্টির যে অখণ্ডতা; অরওয়েলের অবস্থান তারই কেন্দ্রস্থলে।

এই অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব ও বিশ্বাসসমূহই—সাধারণ মানুষ ও তার অধিকারের প্রতি তীব্র আনুগত্য; স্বাধীনতা, সহনশীলতা, সততা ও ভব্যতায় আস্থা; দায়িত্বশীল, চিন্তিত দেশপ্রেম—তাহলে অরওয়েলের বিশ্বদর্শন, এবং তাঁর মতে এসব না থাকলে যে কোনো সমাজ ভয়াবহভাবে অপ্রকৃতিস্থ হতে পারে।

'Nineteen Eighty four'-কে বস্তুত সম্ভাব্য রাজনৈতিক বিবর্তনের মডেল রূপে দেখা যায় যা যুক্তির সমতায় হব্‌স-এর 'Leviathan'-এর সমতুল্য। এমন একটি যুগান্তকারী উপন্যাস অরওয়েল লিখেছেন দার্শনিক থিসিস হিসাবে নয়, নভেলের আকারে। কারণ ঈটনের ক্লাসিক-শাসিত পরিবেশে বর্দ্ধিত হয়েও তাঁর মনটি ছিল অক্সফোর্ডের পণ্ডিতদের মতে "অপরিশীলিত"। হব্‌স্ ভাবতেন, একবার সুস্থ সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে পৃথিবী এমন এক কাল্পনিক প্রকৃতি-শাসিত অ্যানার্কির অবস্থায় ফিরে যাবে, যেখানে মানবজীবন হবে নিঃসঙ্গ, দুঃস্থ, অসুন্দর, অমানবিক ও স্বল্পস্থায়ী (solitary, poor, nasty, brutish and short)। অরওয়েলের ধারণা, সমাজব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা, সহশক্তি ও কল্যাণবোধ অন্তর্হিত হলে পৃথিবীময় একই রাজনৈতিক দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন একটি রাজ্য বা রাজত্ব স্থাপিত হবে নৃশংসতায় যার সমতুল কিছু কেউ কখনও দেখিনি। মতবাদের লেশমাত্র—তা সে কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট, ফ্যাসিস্ট যাই হোক না কেন—তাতে থাকবে না। এবং শুধুই ক্ষমতালোলুপ, অত্যাচারী ও প্রচারসর্বস্ব একনায়কত্ব সৃষ্ট হবে। অরওয়েলের ভাষায়, "If you want a picture of the future of humanity, imagine a boot stamping on a human face—for ever"। স্মৃতি লোপ পাবে; ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে, ভাষা নিয়ন্ত্রিত হবে।

স্পেন থেকে ফিরে আসার পর থেকেই অরওয়েল স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে তার মতবাদ প্রকাশ করতে থাকেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। 'Homage to Catalonia'-তে আগামী দিনে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করেছেন

তিনি। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই অরওয়েল দেখতে পান, স্তালিনিজম ও নাৎসিজম-ফ্যাসিজম এই দুই শাসনব্যবস্থাতেই নেতৃত্ব বা inner party elite ক্ষমতায় থাকবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজকে যেন অন্তহীন ও পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বেঁধে রেখেছে। রাজনৈতিক দার্শনিকদের মধ্যে কোয়েস্টলার, বোর্কেনাউ, সিলোনে ও মালরো একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসেন (১৯৩৬ থেকে ১৯৪০-এর ভেতর)। এবং, এর প্রায় পনেরো বছর পর স্বৈরতন্ত্রের এই সূত্রটি পুনরাবিষ্কার করেন কেউ কেউ—যথা হানা আরেণ্ড্‌ট-এর 'Origins of Totalitarianism' (১৯৫০) বা কার্ল ফ্রিডরিশ ও ব্রেজিন্‌স্কি-র 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy' (১৯৫৬)। এঁরা কেউই অবশ্য 'Nineteen Eightyfour'-এর লেখকের প্রতি তাঁদের ঋণ স্বীকার করেননি।

অরওয়েলের চিহ্নিত বছরে তাঁর বিশ্বদর্শন কতটা বাস্তব? পৃথিবীর সর্বত্র মানবিক বৃত্তির সংঘবদ্ধ বিকৃতি ঘটছে না হয়তো, কিন্তু অর্থশালী "উত্তরে" নিয়ন্ত্রণ, আতঙ্ক, ক্ষমতার একনিষ্ঠ অনুধাবন ও যুদ্ধপ্রস্তুতি ও দরিদ্র "দক্ষিণে" চরম দৈন্য, ক্ষুধা, মৃত্যুর সহাবস্থান তো চলছেই। জোরালো প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে, মিথ্যার ঢক্কানিনাদে পুষ্ট অসৎ অত্যাচারী শাসকশ্রেণী, মানবতার চরম অবমাননা তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে অবাধে কায়েম আছে।

আমাদের সৌভাগ্য, অন্ধকারের শক্তি এখনও পুরোপুরি গ্রাস করেনি পৃথিবীকে, ম্যাকলেনানের সেই "strange creatures bred in the rottenest parts of our woodwork" এখনও আমাদের হারিয়ে দেয়নি। এই শতাব্দী সরল মানুষের সংগুণ ও মূল্যবোধকে বারে বারে আঘাত করছে ঠিকই; তবু মনে হয় আজ বেঁচে থাকলে অরওয়েল আশ্বস্তই হতেন—আমাদের জীবন থেকে পাখির গান, সাধারণ ভব্যতা, প্রকৃতিপ্রেম, "pleasure in solid objects and scraps of useless information" একেবারে মুছে যায়নি।

কবিতাগুচ্ছ

এক প্রবীণ কবির ভাবচ্ছবি : বিরাম মুখোপাধ্যায়

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সচরাচর যা হয়, বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা মারফত নামটার সঙ্গে পরিচয় ছিল প্রথম যৌবন থেকেই। আমি তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে কবিতা প্রবন্ধ ও 'রম্য রচনা'য় হাত পাকাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি আমার দাদা—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আমাদের একডালিয়া রোডের বাড়ীর ড্রয়িংরুমে বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রযুগের 'মধ্যাহ্নে' এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'পরিচয়' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীলদের সঙ্গে—কী লেখক কী সঙ্গীত শিল্পী ধূর্জটিপ্রসাদের আত্মিক যোগ ও ঘনিষ্ঠতা বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণস্মরণীয় অধ্যায়।

আমি যে সময়ের উল্লেখ করছি, বিরাম মুখোপাধ্যায় কবি-খ্যাতিতে যতটা না প্রতিষ্ঠিত বা আলোচিত, কল্লোল-পরবর্তী একটি বিশিষ্ট মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'শতাব্দী'র বিদ্রোহী ধাঁচের অতি-তরুণ সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন ঐ পত্রিকা প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মনে পড়ছে, 'শতাব্দী'র প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি ছিল প্রমথ চৌধুরী মশায়ের। অন্যদের মধ্যে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর (তখন লীলাময় রায়), জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ। এই উচ্চমানের পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ

দাশের সুখ্যাত কবিতা 'শকুন' এবং সম্পাদক বিরাম মুখোপাধ্যায়ের 'সূর্যমুখী'। দাদা এই দুটি কবিতা এবং অন্য কয়েকটি রচনার প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন সম্পাদক কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে। বিরামের 'সূর্যমুখী' কবিতার নির্মাণকুশলতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি অভিনব চিত্রকল্প। বলা যায়, এই কবিতাটির বিশিষ্টতা (তখনকার নিরিখে) লক্ষ্য করে অগ্রজ কবিরা —জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বিষ্ণু দে—তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল কলম থেকে বিশিষ্টতর আরও কিছু প্রত্যাশা করেন।

বোধ হয়, এর বেশ কিছুকাল পরে নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (সর্বভারতীয় আর. এস. পি -র সভাপতি) সম্পাদিত 'ক্রান্তি' পত্রিকায় এবং 'পূর্বাশা' 'বেণু', 'নবশক্তি'তে পর পর কয়েকটি উজ্জ্বল কবিতা লিখে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত কাব্য-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরাম কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, যদিও অনুজ কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য আরও কিছু নাম আধুনিক কবিতার আগ্রহী পাঠকদের তখন যথেষ্ট আশান্বিত করেছিল। কল্লোল-পরবর্তীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তখন সুকুমার সরকার, প্রণব রায় ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সুকুমার সরকার অনেক ধারালো কবিতা লিখে বোহিমিয়ান জীবনে অকাল প্রয়াণ বরণ করলেন। প্রণব রায়ের লিরিকধর্মী রচনাগুলি তাঁকে যশস্বী করে তুলেছিল কিন্তু তিনিও কবিতার রাজ্য থেকে সরে গিয়ে সিনেমা ও রেডিয়োর সার্থক গীতিকার হিসেবে নিজের সুনাম আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিরিকধর্মীতায় আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁর 'পদাবলী' কাব্যগ্রন্থে এবং আরও অনেক রচনায়।

'ক্রান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অন্তর্জলি' কবিতাটি বুদ্ধদেব-সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে স্থান পেল। কিন্তু তাঁরই 'কবিতা' কাগজে প্রকাশিত 'নিরীক্ষা'র মতো তৎকালিক গল্প কবিতারা একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্যসংকলনে কেন স্থান পায়নি, বলতে পারি না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে আছে 'কবিতা' পত্রিকায় 'নিরীক্ষা' প্রকাশের সময়ে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেছিলেন, 'কবিতাটি আমার খুব ভালো লেগেছে।' 'অন্তর্জলি' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আজ চল্লিশ বছর পরেও অতি-আধুনিক গঠনশৈলীতে অবিস্মরণীয়। যেমন :

(১) কঠিন মাটির মায়া কঙ্কাল-মুঠিতে / দুই পা পাতালে

(২) বেশ্যারাত্রি প্রেমের নীলাম হাঁকে দম্পতি-শরীরে/পদ্মিনী জরায়ু ক্লান্ত,

কন্দর্প নাকাল/কী মাহাত্ম্য পুত্রেষ্টির !

(৩) বানপ্রস্থে প্রতিশ্রুত দুটি পায়ে কার্পেট—আরাম—/শতবার সত্য রাম নাম।

'নিরীক্ষা' কবিতা থেকে আর উদ্ধৃতি দিলাম না। প্রায় চল্লিশ বছর পরেও তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির গাঢ় বন্ধ এবং কোনো কোনো বাক্য ও শব্দের উজ্জ্বল দ্যোতনা আজও আমার কাছে অম্লান।

বিরাম মুখোপাধ্যায় একমাত্র স্বীকৃত কবি—আমি যতদূর জানি—আজ পর্যন্ত যাঁর কোনো কবিতার বই বেরোয়নি। অনেক সময় অনুযোগ করেছি, 'এত দিনে অন্তত একটা কবিতা সংকলন থাকা উচিত ছিল।' লাজুক হেসে বিরাম উত্তর দিয়েছেন, 'যথাসময়েই দেখতে পাবেন।' সম্প্রতি বিজ্ঞাপনে দেখলাম, সেই যথাসময় বোধ হয় এত দিনে সমাগত।

প্রখর যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচক এবং সম্পাদকের দায়িত্বশীল ঝাড়াই-বাছাই কর্মেও বিরামের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারি এবং আরও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকায় লেখার পরিমাণ ক্রমশ কমতে লাগল। কিন্তু ১৯৪৬-৫২ সাল পর্যন্ত শারদীয় 'দেশ', শারদীয় 'আনন্দবাজার' ও অন্য দু একটি পত্রিকায় বেশ ধারালো কয়েকটি কবিতা আমার মতো অনেক মনোযোগী কবিতা-পাঠকের রীতিমত সাধুবাদ ও অভিনন্দন কুড়িয়েছে। যেমন, শারদীয় 'দেশ'-এর 'কল্কিপুরাণ', 'নীলাম', 'বিরল মুহূর্ত', 'সার্কাস' প্রভৃতি কিছু কবিতা। 'কল্কিপুরাণে'র কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে—

(১) ধনধান্যে শূন্য পুঁজি/বুদ্ধিমার্গে দ্রাক্ষাকুঞ্জ/হাতছানি রসালো ছায়ার/ গৃহকোণে সাজালেম কাগজের নকল গোলাপে/ভ্রমর কি আসবে ভুলেও ?

(২) সিঁদুর-মেঘের মৃদু কটাক্ষ শাসন/ঘরপোড়া হেসেই ওড়ায়।

(৩) ঘুণ-ধরা মেরুদণ্ডে দিগ্বিজয়ী বাচাল নায়ক···ইত্যাদি। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই।

সুখের কথা, কবি বিরাম মুখোপাধ্যায় অনেককাল পরে কবিতাচর্চায় ফিরে এলেন এক পরিশীলিত অনুপ্রেরণা নিয়েই। তাঁর কাছে আমাদের কিছু পাওনা ও প্রত্যাশা ছিলই। রীতিমত আশঙ্কাজনক অসুস্থতার মধ্যেও বিরাম বিগত দু এক বছরে দু একটি শারদীয় বিশেষ সংখ্যায় ও রবিবাসরীয় পৃষ্ঠাতে কয়েকটি প্রকৃত ভালো কবিতা লিখেছেন—যেমন 'ছত্রিশ রাগিনী' সিরিজের কয়েকটি, এ বছরের শারদীয় 'কালান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ক্লারা জেটকিন : কবরে

কিছু ফুল'-এর সপ্রশংস উল্লেখ শুনেছি বিদগ্ধ কবি ও কাব্যপাঠকের মুখে-মুখে। বিস্মিত করেছে বিরামের 'কালো দিয়ে শাদা আঁকো' নামের দীর্ঘ কবিতাটি। আমাদের ক্রম-ঐতিহ্যলুপ্তির এবং সুবিধাভোগী উচ্চচিত্ত ফাঁপা মগজের ও বিভ্রান্ত বর্তমানের আসল চেহারাটা সূক্ষ্ম ও দৃঢ় দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছে ছবিটি। বিরামের আগেকার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল তীক্ষ্ণ তির্যক ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনার ঘন সংহতি, সরলে-কঠিনে কোলাকুলি। কিন্তু বড় করুণ গভীর বেদনার বিস্ফোরণগুলি—বহু বর্ণের মিশ্রিত উজ্জ্বলতায় তাঁর সাম্প্রতিক দীর্ঘ কবিতাগুলি। নিখুঁত জীবনছবি আঁকবার নিপুণ ক্ষমতায় বিরাম আধুনিক কবিতাকে তার ন্যায্যরূপে সহজবোধ্য সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন। কী অব্যর্থ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সুমিত ব্যবহার ও অতি-চেনা চিত্রকল্পের প্রয়োগ ! প্রায় সব কবিতাতেই পাই বনেদী ও মজবুত গাঁথুনি। 'বিনা টিকিটের যাত্রী' কবিতাটিও গভীর অর্থবহ—প্রতিটি ছত্র নির্মাণে ও ব্যঞ্জনায় সমকালীন জীবনযাপনের অসারতা অগভীরতা আর বেদনার্ত শূন্যতাকে যে ভাবে এক্কা-দোক্কা খেলার চুনো খড়ির ছকে এঁকেছে, তা সমগ্রতার নিটোল চিত্রধর্মিতায়, বিশেষ করে শেষ পঙ্‌ক্তিটির চমকে-দেওয়া ব্যঞ্জনা, আধুনিক বাংলা কবিতার মেরুদণ্ডহীনতার দুর্নাম মুছে দিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর ব্যাপী আমার সম্পর্ক যতই ব্যক্তিগত হোক, তাঁর সম্বন্ধে এই পরিচিতিটুকু নিরপেক্ষ ও বিচারগ্রাহ্য হবে বলে আশা করি। সেই 'ভবিষ্যৎ' ও 'অগ্রগতি'র কালপর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি সাহিত্যচর্চায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছেন। কাবতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে সংযম শৃঙ্খলা ও রুচি-জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন, প্রকৃত সাহিত্যরসিক হয়ে তিনি অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও, কি প্রকাশনায় কি সম্পাদনায় সেই তথ্যনিষ্ঠ নির্ভুল আপোসহীন দায়িত্ব পালন করে উচ্চ মানরক্ষার একটি বড় নজির স্থাপন করতে পেরেছেন। এটাই বিরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ত্রুটিহীনতার দিকে তাঁর নিরন্তর প্রয়াস। কবি-সত্তা আর কর্মী-সত্তা তাঁর জীবনে একাত্ম হয়ে আছে। তার কারণ, বিরাম হচ্ছেন 'পার্ফেকশনিস্ট'।

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা

কালো দিয়ে শাদা আঁকো

(শ্রী সত্যজিৎ রায়-কে)

খিল্ খোলো—
কপাটের খিল খোলো ;
নেই, কোনো অভিসন্ধি আড়ি পেতে নেই।
তেলচিটে পর্দাটা সরাও—
কড়ি-শাদা শূন্য ফুলদানি
দেয়ালের সুপ্রাচীন পদ্মের নমুনা
মন কাড়ছে না ?
খিল খোলা,—
উৎপিঞ্জর আলো ও হাওয়ার বন্যায়
এঁদো-কালো ঘর
শুভ্রতার নিবিড় প্রচ্ছায়া।

বাবা বাড়ি নেই,
বিজ্ঞ আর বিচক্ষণ পিতামহ গত ;
অনেক আগেই
প্রপিতামহের নাম-সম্পর্কের ইতি।
বামোক্ত সংস্কৃতি
পর্দা-ঢাকা ঘরে
শৃঙ্গাররসের ঢেউ সচল ভিডিও
চৌষট্টিকলার কেলি লাতিন মেজাজে
ছড়াচ্ছে কুহক
সব সুখ স্বৈরিণীর যোনি।

দেয়ালের ফাটলে ফোকরে
স্থলকালি, মাকড়ের জাল

নোনাধরা ইট-কাঠ বুকে
ধ্বংসস্তূপ দাঁড়িয়ে বাড়িটা—
বহুপুরুষের ভদ্রাসন
ঘুঘু-চরা ভিটে।
হাঁ-করা ফাটল
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়,
জড়ানো পাকানো
শেষ যবনিকা দ্রুত নেমে এলো :
দু'যুগ না যেতে
পদ্মার পাথুরে বাঁধ
ভূতচতুর্দশীর রাতে ঝুপ্‌ঝাপ ভাঙছে ডুবছে
ক্ষিপ্ত কালো ঘূর্ণির গর্জনে।

এখন তো খরার নিশ্বাস
ধানের বুকের দুধ চিটে ;
ঠাস ঠাস
অভাবের নিয়ত প্রহারে
আপামর মানুষের মুখে আর পিঠে
পুরু কালশিটে,
জল-পুলটিস
মলম ও মালিশে যাবে না ;—
মহাশয় মানুষেরও মনে সুখ নেই।

শতাব্দীর শেষপাদ। উষ্ণ ওয়ারিশ
মায়ের জরায়ু থেকে শিরদাঁড়া বাঁকা,
কাজল-কাজল চোখ, আহা, স্বপ্ননিধি
লাল নীল সবুজ সোনালী ভায়োলেটে
এমনকি অ্যাটম্‌কেও গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে
বানিয়েছে ফুলের নকশায়

বাহারী কার্পেট
—মালঞ্চ হয়নি।
কী দিয়ে আঁকবে তাজা কুন্দের শুভ্রতা ?
পায়রা-পালক শাদা
কোথায় উধাও ?
শাদা দাও।

আপাতত হাতে নেই রঙের তুরুপ,
কালো দিয়ে শাদা আঁকো।
কে বলে কালোর রূপ নেই
কোন্ মিথ্যাবাদী ?

না, না—মহাশ্মশানের পোড়া কয়লায়
অঋজু আঁচড়ে নয়
সস্তা প্যাস্টেল।
আজ এই হরিহরছত্রের মেলায়
রঙ্‌চটা হাল্‌কা-পল্‌কা অসংখ্য মুখোশ
দ্রুত মোটা মুনাফা লুঠ্‌ছে—
মানতেই হয়
কলা-কুশলতায় কিছু খাম্‌তি নেই।

ধন্য !
ধন্য, এই শিল্প-
মুখোশের চতুর আড়ালে
ধীমান কৌশলে
আদিম জন্তুর পেশা
লুটেপুটে চেটেমুছে হজম করছে
এইসব কন্দর্পনিন্দিত বরতনু,
শত শত শঠ শয়তান,

চৌকশ চোয়াড়ে
ফিচেল ও ফন্দিবাজ ছদ্ম দেশপ্রেমী,
ভণ্ড সাধু, না-ঈশ্বর প্রাজ্ঞ মহাজন
খুব্ সুরত গণিকা বিদুষী ;
—রাংতামোড়া সব আবলুস
তুচ্ছ অবহেলে
পূর্ণগ্রাস গ্রহণের দিনে
শিল্পীর বীক্ষণে
অবিমিশ্র রূপ রঙ রস ছুঁয়ে ছেনে
ছিমছাম ছোটো আয়তনে
এই অ্যালবাম।

তলিয়ে দেখুন :
মিশকালো ভেলভেট-ফ্রেমে-আঁটা
দিগ্বিজয়ী সোনার ময়ূর
ঝাম্‌রানো মেঘের আসরে
কী খুশির পেখম মেলেছে !
ছবিটা কালোই।

কী দাম দেবেন ?

বিনা-টিকিটের যাত্রী

এক্কা-দোক্কা এখনো ভুলিনি,
শৈশবের হট্টিহট্টি-লাফ
কিত্‌কিত্ পা-দুটোর খেলা
চুনোখড়ি-দাগানো এলাকা—
তীরন্দাজ চোখ
পায়ের বাঁকানো ছোটো চেটো

বেকায়দার ছোট্ট একটু ভুলে
—অকুশল অশুদ্ধ মুহূর্তে—
ছিটকে বেরুলো ঘুঁটি নাগাল পেরিয়ে
মার খেলো কিল্লা মারদিয়া।

প্রথম এ পরাভব মেনে নিলো হাসি-হাসিমুখ
হট্টিহট্টি-খেলা ও মজার
দু'পায়ের অপটু আঙুল,
কাঁচা আফশোষ
খরধার তীব্রতায় বেঁধেনি গভীরে···
এ-খেলায় হার-জিত্ তেমন-কিছু না।

চুনোখড়ি কবে মুছে গেছে।
লক্ষ কোটি চড়াই উৎরাই
আমল পায়নি পায়ে কাঁটা,
কিংবা ছক-কাটা জীবনের দক্ষিণান্ত
পথে ও বিপথে
নখছেঁড়া রক্তাক্ত হোঁচট
অতিসোজা নামতার গুণিতকে হাস্যকর ভুল,—
ভুল,—ভুল,—ভুল
বিচক্ষণ বয়স-বুদ্ধিতে
হার-মানা পুরনো দানের
ঘুঁটিটাই বার-বার তির্যক তাকায়
অগ্নিগ্রীব একাক্ষর আদায় করছে
ডবল মাশুল।

বিনা-টিকিটের যাত্রী চেকারের হাতে পাকড়াও।

ছত্রিশ রাগিণীর আরো-একটি

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে
রজনীগন্ধাবনে—
ঝিকমিকিয়ে উঠলো
ভি আই. পি.-রোডের আনাচকানাচ
হঠাৎ মুক্তো-ঝরানো
মুক্তছন্দের গদ্যকবিতা।

এ-পাড়ার বাসনাকে চেনো?
উঠোনের দামাল কামরাঙা গাছের মতো
মদন মস্তানের ডব্‌কা বউটা!
সুখ নেই মনে,
গাঁটছড়াটা মজবুত ছিলো না হয়তো।
আলুনি-সোয়াদ শুধু শরীরটা,
ঘেন্না ধ'রে গেছে
মাতালের ছোবলানো সোহাগে;
মোটা ভাত মোটা কাপড়ের
ভরাট গতর
ঝড়ের রাতের দাপট
গর্জাচ্ছে মজ্জায় মজ্জায়—
মন রজনীগন্ধা হয়নি;
ছেঁড়া পাপোষ
মদনের দোর আগলাচ্ছে
শাপভ্রষ্টা সূর্যপত্নী ছায়া।

মালকড়ির আমদানিতে
টিনের এঁদো-ঘরটা
হঠাৎ ইন্দ্রের বিলোল মাইফেল,
সলিডস্টেট টি.ভি.র রঙিন ফোয়ারা

নগ্নকটি নটিনীদের অপাঙ্গ হিল্লোলে।
গনগনে বাসনা
তার গঙ্গাজল টগরের
গলা জড়িয়ে
খুঁটে খুঁটে সুখের কুঁড়ি গুনছে টি.ভি.-র পর্দায়

নিত্য যাতায়াতের পথ—
অচ্ছোদ সরসীনীরে
আজ নজর কাড়লো নকল বিজয়িনী ;
হার মেনেছে হেমেন মজুমদারের
সিক্তবসনা সুন্দরী।
নেহাৎ ফ্যাল্না নয় এই জলকেলির ছবি :
এলোথোঁপায় গোঁজা ট্যারচা রঙিন টুথ্ব্রাশটা,
বুক-জলে দাঁড়িয়ে
গা থেকে রগ্ড়ে-রগ্ড়ে তুলছে
গেল-রাতের দুর্গন্ধ ময়লা ;
নগ্ন স্তনবৃন্ত জলে ভাসছে
দুটি ডাঁশা করঞ্চ ফল,
ফাজিল পানকৌড়িরা পাল্লা দিচ্ছে
কে আগে যুগল-স্বর্গে পৌছুবে
—কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই বাসনার ;
চাঁপাকলি আঙুল
আদরের বিলি কাটছে
ঝিরিঝিরি জলের ঝালরে।
নেশা-ধরানো পদ্মপাপড়ি-ঠোঁট
সরু সরু গুলকুচি ছুঁড়ছে,
ঝিক্মিকিয়ে উঠছে অগুন্তি চিকন ইন্দ্রধনু
তার টলটলে রঙিন আরশিতে
লক্ষীটেরা-চোখ

প্রতিচ্ছবি দেখছে বিজয়িনীর।

এক ফুঁয়ে
নিভে গেল অপরাহ্নের সূর্য।
আকাশের ঈশানে
পালে-পালে ধেয়ে আসছে মহিষরঙা মেঘ ;
একটু নিরেট কালো স্তব্ধতা,—
লক্লকিয়ে উঠলো বিদ্যুতের চাবুক,
কানের পর্দা-ফাটানো
বাজ পড়লো দুটো।
শহরের উপকণ্ঠ কলকলিয়ে উঠলো
অসংখ্য শঙ্খধ্বনিতে।
পুকুরপাড়ের ইউক্যালিপটাসের প্রহরী
উঠলো চম্কে,
কামিনীর ভরন্ত ঝাড়
আচমকা ঝরিয়ে দিলো
গুড়ো-গুড়ো শাদা স্বপ্নগুলো।
তৃষ্ণার্ত আঙুল ভয়ে কাঁপলো না
জলের চঞ্চল ঝালরে
বিলি কাটছে তখনো।

দাঁড়িয়ে পড়েছে পড়শী—
এতক্ষণে তাকাতে পারলো
আচ্ছোদসরসীনীরে :
জলছবির খিলখিল হাসি
গভীর বিদ্ধ করলো পড়শীকে।

আবার দুটি বাজ—

চিড়-খাওয়া প্রৌঢ় পাঁজরার
আর্ত উত্তর :
আমি তো বচ্চন নই,
জথ্‌মীদিল-চাউনিটা নামাও ॥

আলোচনা

কৌলিন্যের সন্ধানে

বিচিত্র গুপ্ত

রাজনীতির চেয়ে মুখরোচক আলোচনার বিষয় আর হয় না। চায়ের আড্ডা, রেলগাড়ীর কামরা, ডিনার বা ককটেল পার্টি—কয়েকজন একত্র হলেই একথা ওকথার পর যেন একটা দুর্বার আকর্ষণের টানে সব কথা তর্ক রাজনীতির দিকে এগিয়ে যায়। তর্ক এবং উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন হয়তো একজন টেবিল চাপড়ে বলেন, "তুমি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও তো তাহলে তোমার কথা মানবো।" রাজনৈতিক তর্কে শত যুক্তি স্থাপিত উপস্থাপিত হওয়ার পর, কেউ কি কখনও দেখেছেন একজন আরেকজনের কথা মেনে নিয়েছেন? কখনই তা দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা যাক—

এক গ্রামে একজন বড় পণ্ডিত এলেন, তর্কযুদ্ধে তাঁর কখনও পরাজয় হয়নি। গ্রামে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন বহিরাগত পণ্ডিতকে তিনি তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং দ্রৌপদীর মতো বাজী রেখে বসলেন নিজের ব্রাহ্মণীকে। এদিকে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে পৌছবার আগেই কথাটা কি করে ব্রাহ্মণীর কানে পৌছে গেছে! শুনে ব্রাহ্মণী তো খেপে লাল। ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরলে দুজনের 'ডায়ালগ্'টা এই রকম হোল—

মিনসের এখনও আক্কেল বলে কিছু হোল না? ঐ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে নামবে? আবার তাতে নিজের বৌকে বাজী রেখেছ?

তা···তা ব্রাহ্মণী, কি হয়েছে তাতে?

কি হয়েছে তাতে? যদি হেরে যাও, তাহলে আমাকে ঐ ভিন্‌দেশী

পণ্ডিতের ঘর করতে হবে এই বয়সে! বলতে বলতে ব্রাহ্মণী কাঁদতে আরম্ভ করলো। কান্না দেখে ব্রাহ্মণ বিচলিত। ব্রাহ্মণীকে আশ্বস্ত করার জন্য বললো—

আহা হা হা, কাঁদো কেন, কাঁদো কেন? আরে আমি নিজে হার না স্বীকার করলে, আমাকে হারায় কোন শা···?

ব্রাহ্মণের কথাই ঠিক—রাজনীতির তর্কে যে যতই যুক্তি দিক কোন পক্ষই কিন্তু মত পরিবর্তন করেন না বা হার স্বীকার করেন না। এর প্রকৃত কারণ হোল এদের কারুরই রাজনৈতিক মতামত শুদ্ধ যুক্তি-নির্ভর ও গভীর চিন্তা-প্রসূত নয়। আমাদের মতগুলো আগেই ঠিক হয়ে থাকে নিজেদের প্রয়োজন মতো রুচি, সংস্কার এবং বিশ্বাস অনুসারে। অনেক ক্ষেত্রে মতটা আমাদের অজ্ঞাতেই তৈরী হয়ে যায় পারিপার্শিকতার প্রভাবে অথবা আমাদের পছন্দমতো কোন আদর্শ পুরুষের ভাবনায়। এবার আবার মূলে ফেরা যাক্। আড্ডায়, রেল কামরায়, পার্টিতে—দৈনন্দিন জীবনে যে সব অগভীর রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করি তাতে কারুরই মত যুক্তির দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। ধরা যাক একটি তর্ক যাতে লিপ্ত হয়েছেন একজন অহিংস গান্ধী পন্থী এবং আরেকজন সন্ত্রাসবাদী অথবা দক্ষিণ (কংগ্রেস) পন্থী এবং বামপন্থী। এখন সমস্যা হলো যিনি অহিংস পথের সমর্থক, তিনি কিন্তু পক্ষ বা বিপক্ষের সব যুক্তি গভীর ভাবে বিচার করে হননি। আবার যিনি সন্ত্রাসবাদী তিনি কখনো কখনো তাঁর মত স্থির করেন কোন একটি বিশেষ কারণে বা বিশেষ যোগাযোগের মুহূর্তে—জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে—পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি-কারণ ওজন না করেই। এখনকার আড্ডায় কিন্তু গান্ধী বনাম সন্ত্রাসবাদের তর্ক একেবারেই জমে না। তার কারণ একটা বোধহয় এই যে বাংলাদেশের জোলো রাজনীতির চেতনা এসেছে মূলত ক্ষুদিরামের ফাঁসির সেন্টিমেণ্টালিজমকে কেন্দ্র করে। তারপর আবার বিনয় বাদল দীনেশের আত্মবলির কাহিনী শুনতে শুনতে ক্রমশ আমাদের মন সন্ত্রাসবাদীদের দিকে অনিবার্যভাবে ঝুঁকে গেছে। গান্ধীর অহিংসার বাণী তাই বাঙ্গালীরা সাধারণভাবে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। তর্কযুদ্ধে সবচেয়ে জমজমাট হয় যখন আলোচনাটা এমন দুজনের মধ্যে হয় যার একজন হলেন কংগ্রেসপন্থী আরেকজন হলেন মার্ক্সবাদী। কংগ্রেস-পন্থী এক এক করে পাখি পড়ার মতো বলে যান, কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশে কত উন্নতি হয়েছে—শিল্প ক্ষেত্রে কত প্রসার হয়েছে কত কলকারখানা কত রাস্তা-ঘাট হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, কমিউনিষ্টরা ক্ষমতালাভ করে শুধু

খুনোখুনি করেছে আর গুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। যিনি মার্ক্সবাদী তিনি বলেন, কোন কংগ্রেসী মন্ত্রী কি করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের উভয় পাক্ষিক অনেক গোপন তথ্য এই অবসরে প্রকাশ পায়। খুনোখুনি-গুণ্ডামির কথা? সে পথ তো কংগ্রেসই প্রথম দেখিয়েছে। নিজেরাই খুনোখুনি আরম্ভ করে তারপর শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে বলে উত্তেজনা সৃষ্টি, এতো কংগ্রেসীদেরই শেখানো ষ্টাইল,—যেমন হয়েছিল কেরালায় 'বিমোচন সংগ্রাম'। আর কলকাতা শহরে গোপাল পাঁঠা কাটা কেষ্টর দল কত হরিনাম বিলিয়েছে তারও সবিস্তার উল্লেখ হয়। এত তর্ক, যুক্তি, তথ্য বলার এবং শোনার পরও যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সে কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন—এক চুলও এদিক ওদিক হতে রাজী হন না। এর কারণ, তাঁরা যে-সব মত পোষণ করেন সেগুলো শুদ্ধ ন্যায় নীতির কষ্টি পাথরে যাচাই করেননি। কংগ্রেসকে যিনি সমর্থন করেন তিনি কতকগুলি ব্যক্তিগত কারণে করেন এবং যিনি মার্ক্সবাদী তিনিও সবসময়ে যুক্তিসিদ্ধ নন।

মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন মানুষের শ্রেণী সত্তাই আসল এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে যে শ্রেণীভুক্ত, সেই অনুসারে সে রাজনীতিক দলে যোগদান করে। অর্থাৎ, যে শ্রমিক বা সমগোত্রীয় সে শ্রমিক দলে যোগ দেয় এবং যে মালিক বা সমমনোভাবাপন্ন তাকে মালিক দলের স্বার্থরক্ষাকারী পার্টিতে যোগ দিতেই হয়। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? আমাদের দেশে আধুনিক কায়দায় শিল্প-প্রসারণের বীজ কিন্তু বিদেশ থেকেই আমদানি করা। এমনকি শিল্প কর্মী-দের ও শিল্পপতিদের শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত আধুনিক তাত্ত্বিক-জ্ঞান বিদেশ থেকে পাওয়া—হয় সরাসরি না হয় পশ্চিমী শিক্ষা বা বিদেশী বই-পত্র-পত্রিকা মারফৎ। প্রশ্ন উঠতে পারে সে সব দেশেও কি শ্রমিক বা মালিকপার্টিতে লোকে ঢুকেছিল মার্ক্স্-এর নির্দেশমত শ্রেণীচরিত্রের ভিত্তিতে? এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর কিন্তু এখনো সব দেশে পাওয়া যায়নি।

ধরা যাক্ বৃটেনের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দেওয়ার পরও চার্চ্চিলের দল বিপুল ব্যবধানে লেবার পার্টির কাছে হেরেছিল। লেবার পার্টি সরকার গঠন করলো এ্যাট্‌লীর নেতৃত্বে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে লেবার পার্টির সাফল্য অনেকের মনে আশা জাগিয়ে তুললো। অনেকেই ভাবলেন, বৃটেনের শিক্ষার মান বেশী, তাই শ্রেণী চেতনাও বেশী, অতএব দেশের লোকেরা শ্রমিকদলকে জয়ী করেছে এবং ঐ দেশে শ্রমিকেরা এই ভাবে ধাপে

ধাপে এগিয়ে যাবে এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করবে। সমাজবাদী চিন্তানায়কেরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই ভাবেই ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র বিদায় নিয়ে সমাজবাদের জন্য জায়গা করে দেবে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এই 'গাইড্ লাইনস্' ধরে চললো না। প্রথমত সব লোক নিজ নিজ শ্রেণী চরিত্র অনুযায়ী পার্টিতে যোগ দিলেন না এবং যাঁরা প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন পরে তাঁরা তাঁদের আনুগত্য স্থানান্তরিত করেন।

১৯৪৫ সালে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলো, কিন্তু সরকারের বাইরে নির্বাচনে জেতার আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যত সহজ; ক্ষমতা লাভ করে সেই প্রতিশ্রুতি পরিপূরণ করা কিন্তু তত সহজ নয়। লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসে কয়লা, রেল রাষ্ট্রীয়করণ করলেন, 'হেলথ্ সার্ভিস' প্রবর্ত্তন করলেন, শিশুভাতা প্রবর্তন এবং আরও অনেক সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু করলেন। এই সংস্কার মূলক ব্যবস্থাগুলো মিশ্র সাফল্য লাভ করলো এবং তার ফলে জনসাধারণের অস্থিরতা নতুন ভাবে সুরু হলো। লেবার পার্টি সম্বন্ধে অনেকেরই মোহমুক্তি ঘটলো যার প্রতিফলন দেখা গেল ১৯৫০ এর নির্বাচনে—যে নির্বাচনেও লেবার পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো ঠিকই কিন্তু আগের ব্যবধান অনেক কমে গেল। লেবার পার্টির মধ্যেও অন্তর্বিরোধ সুরু হলো। আরও অন্যান্য কারণেও ১৯৫১ সালে এ্যাট্‌লী পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ওই বছর অক্টোবরে অন্তবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই অন্তবর্তী নির্বাচনে চার্চ্চিল আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন।

১৯৫১ সালের নির্বাচনের আগে যে সব আলোচনা এবং তর্কাতর্কি প্রত্যক্ষ-ভাবে শুনি তা আমাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। তখন অল্প বয়েস এবং শোষিত দেশ থেকে যাওয়ার জন্য তখন মন স্বাভাবিকভাবেই সমাজতন্ত্রের দিকে একটু ঝুঁকে—শোষণকারী ধনতন্ত্রবাদকে মন কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। যে সব কলকারখানায় শিক্ষানবিশী করেছি তখন, সেখানকার লোক-জনদের আলোচনা ও তর্ক মন দিয়ে শুনতাম। দেখলাম, সব শ্রমিক কিন্তু লেবার পার্টির সমর্থক নয়! দেখা গেল অনেকেই দৃঢ়ভাবে এবং সততার সঙ্গে 'কন্‌সারভেটিভ্'দের তখন সমর্থন করে। দেখে শুনে বেশ খটকা লাগলো—মার্ক্‌স্ বলেছিলেন শ্রেণীসচেতন শ্রমিকেরা শ্রমিক দলেই যাবে! তবে কি মার্ক্‌স্-এর শিক্ষা টেম্‌স্-এর জলে ভেসে যাবে? সন্দেহটা দূর

করবার জন্য তখনকার কয়েকজনকে (উভয় দলের) জিজ্ঞেস করলাম এই অন্তর্বিরোধের কারণ। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে যা জানলাম তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রেণীগত আনুগত্য শুধু জীবিকার দ্বারা নির্ধারিত হয় না শ্রেণীয় আত্মোপলব্ধিটা বহুল পরিমাণে মানসিকতা প্রসূত। কাজেই কেউ শুধু শ্রমিকের কাজ করে বলেই যে শ্রমিকদলে যাবে এটা ধরে নেওয়া একে-বারেই যুক্তিযুক্ত নয়। শ্রমিকদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা বংশানুক্রমে কোনো লর্ড-এর বাড়ীতে কাজ করেছে, তারা কিন্তু লেবার পার্টিতে যোগদান করেনি। আর মানসিকতার কথা যা শুনলাম তা কিন্তু ঐ দেশের মার্ক্‌সবাদী নেতাদের মুখে আগে কখনও শুনিনি। ভোটদাতাদের মধ্যে অনেকে আবার দেখতে লাগলেন কারা কোন দলে শেষ অবধি ভোট দেন। তাঁরা দেখলেন, যাঁরা বিত্ত-সম্পন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর, তাঁরাই ভোট দিচ্ছেন কন্‌সারভেটিভ্ দলকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঠিক করে ফেললেন (হয়তো ভ্রান্তভাবে), তাঁরা যদি কন্‌সারভেটিভ্ দলকে ভোট দেন তাহলে তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সমতুল হবেন। এঁদের অনেকেরই আর্থিক স্বাচ্ছল্য নেই, জীবন-ধারায় স্বাচ্ছন্দ নেই, তবুও কোনও একটা মানসিক কারণে এঁরা কুলিমজুরদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে অক্ষম। এই ধরণের একটা 'ফেনোমেনন' বোধ হয় আমাদের দেশেও ঘটছে। শুধু আর্থিক স্বাচ্ছল্য বা অবস্থার ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভোট বা রাজনৈতিক মতবাদ ভাগ হয়নি। তা ছাড়া আমাদের দেশে বিশেষ করে বাঙ্গালীদের চরিত্রে একটা দ্বিবিভাজন (dichotomy) আছে। 'ইন্টেলেকচুয়ালী', বাঙালীরা সহজেই সমাজতান্ত্রিক কিন্তু 'সোস্যালি' তাঁরা আবার বুর্জোয়া। যখন নিছক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেন, তখন বাঙ্গালীরা শোষণবাদী ধনতন্ত্রকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। আবার মনে মনে প্রগতিশীল উদার মনোভাব পোষণ করেও তাঁরা অ-বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহজভাবে মিলতে পারেন না—কেমন একট 'মধ্যবিত্ত'র বর্ম পরে চলেন। কাজেই আমাদের দেশে শুধু খাবারের মধ্যে নয় রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যেও একটা ভেজাল পাওয়া যাবে। তাই যাঁরা ধনতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁদের গায়েও একটু একটু লোকদেখানো সমাজতন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বৃটেনের রাজনীতিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক্। ১৯৫১ সালে চার্চ্চিলের কনসারভেটিভ্ দল ক্ষমতায় আসীন হয়ে অর্থনীতির চাকাটা পিছন দিকে

ঘোরাবার চেষ্টা করলো। তবে, একেবারে মারমুখী কট্টর ধনতন্ত্র নয়—সমাজ-কল্যাণ মূলক ভাবমূর্তিটি বজায় রেখে যতটা পারা যায় ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোল। কনসারভেটিভ্‌রা ক্ষমতায় থাকলেন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত—তারপর আবার লেবার পার্টি ক্ষমতায় ফিরে এলো হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে। লেবার পার্টির শাসন কালে যবনিকা পাত ঘটলো ১৯৭৯। একবার কনসার-ভেটিভ আর একবার লেবার—এ রকম হচ্ছে কেন? মার্কসের নির্দেশ অনুসারে তো কনসারভেটিভ্‌দের দল ছেড়ে লেবার পার্টিতেই দলে দলে লোক আসার কথা! ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক না হয়ে দুদিক থেকেই দল বদলাবদলি হচ্ছে কেন? লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসে সাধারণ লোকেদের জন্য অনেক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করেছেন—তবু এই সব লোকেরা ভোট দেবার সময় কেন 'কনসারভেটিভ্' হচ্ছেন? ভোটদাতারা কি অকৃতজ্ঞ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন জর্জ ব্রাউন তাঁর স্মৃতি চারণে 'ইন মাই ওয়ে' বইটিতে। জর্জ ব্রাউন একজন ট্রেড্ ইউনিয়ন কর্মী এবং মনে থাকতে পারে তিনি ছিলেন হ্যারল্ড উইলসনের ক্যাবিনেটে উপ-প্রধানমন্ত্রী—পরে মত পার্থক্যের জন্য পদত্যাগ করেন। স্মৃতিচারণে নানা কথার পর এক জায়গায় লিখেছেন, 'কনসারভেটিভ্‌রা যখন ক্ষমতায় থাকেন তখন তাঁদের দৃষ্টি থাকে 'প্রাইভেট্ ক্যাপিটালিষ্ট'দের মুনাফার দিকে, তাই শোষণমূলক কর্মসূচীর পিছনে এঁদের সমর্থন থাকে। তাই তাঁদের শাসনকালে কলকারখানায় লোকেরা দলে দলে চাকুরী খোয়ায়। তখন তারা খোঁজে এমন একটি সরকার যার সাহায্যে চাকরীতে পুনর্বহাল হওয়া যাবে। তাই নির্বাচনে তারা ভোট দেয় লেবার পার্টিকে। লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর বেকারদের আবার কর্মসংস্থান হয় এবং এদের অবস্থা ফেরে। তারপর কিছুদিন ভাল করে খেয়ে দেয়ে যখন পেটের খিদে মিটলো, ভাল জামাকাপড় পরে তারা, তাদের শ্রমিক সত্তাটি খুইয়ে নিজেদের 'ভদ্রলোক' ভাবতে থাকে এবং পরবর্তী নির্বাচনে আবার কনসারভেটিভ্ পার্টির পক্ষে ভোট দেয়। এই ভাবেই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে লেবার ও কনসারভেটিভ্ সরকার।

এবার আমাদের দেশের দিকে চোখ ফেরানো যাক্। চক্রবৎ পরিবর্তনের 'ফেনোমেনন্' কি আমাদের দেশেও হচ্ছে না বা হবে না? আমাদের দেশের বামপন্থী রাজনীতিকদের গভীরভাবে কথাটা চিন্তা করার সময় এসেছে। এক সময় যাঁরা 'ইনক্লাব, জিন্দাবাদ' বলে মিছিল-ভিত্তিক সংগ্রাম করে মালিকদের

কাছ থেকে বেশী মাইনে, বেশী বোনাস আর 'ওভারটাইম' আদায় করেছেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই এখন দেখা যাচ্ছে মিছিলে যোগদানের অনিচ্ছা। শ্রমিক থেকে এঁরা হঠাৎ ভদ্রলোক হচ্ছেন। যে সব তথাকথিত 'ইন্‌টেলেকচুয়াল'দের মতবাদ একসময় শ্রমিকপন্থী ছিল, পরে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মতবাদের রংটা বেশ ফিকে হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে বেশ নামকরা একজন চিত্র পরিচালক আছেন যিনি একদা বেশ জোর গলায় বামপন্থী মত প্রকাশ করতেন। পরে কয়েকটি পুরস্কার পেয়ে, সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে এখন এমন সব কথা বলছেন যা থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁর মতবাদ হয়তো বা বাঁ থেকে ডান দিকে মোড় ফিরছে। তাহলে কি চাঁচ্চিলের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি—সমাজতন্ত্র অসফল বা ব্যর্থ লোকের রাজনীতি?

রাজনৈতিক মতবাদ গঠনে বা পরিবর্তনে নীতি-পরিশ্রুত যুক্তির স্থান খুবই সামান্য। বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে শুধু একটাই লক্ষ্য থাকে—কোথায় বেশী প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। অর্থাৎ ভোটদাতাদের মতামত নির্ধারিত হয় কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি আনুগত্য থেকে নয়—মতামত গঠন ও স্থানান্তরিতকরণ একান্তই স্বার্থ বা সুযোগ ভিত্তিক।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দল পরিবর্তনের জন্য নাম করা হোত ফজলুল্ হক সাহেবের। স্বাধীনতা লাভের পর কয়েকজন নেতা যে হারে দল বদলেছেন তাতে হক্ সাহেবকেও কবরে পাশ ফিরতে হয়েছে। দল-পরিবর্তনের প্রধান কারণ, বর্তমান রাজনৈতিক মতবাদে 'ইডিওলজিকাল কনটেন্ট্'-এর একান্ত অভাব। আগে রাজনীতি ছিল একটা ব্রত এখন তা হয়েছে একটা পেশা। রাজনীতির চেহারার বিবর্তনেরও একটা কারণ আছে। আমাদের দেশে রাজনীতির জন্ম বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। রাজনীতির মধ্যে ছিল সংগঠন ও আন্দোলন। স্বাধীনতালাভের পর আন্দোলনের পেছনে উত্তেজনা কমলো এবং তার তারপর এলো আরেক অধ্যায়। আমাদের দেশে প্রবর্তন করা হোল পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা যার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক কল্যাণকর্ম। এরকম একটা আচমকা পরিবর্তনের জন্য দেশের বেশীর ভাগ লোকই প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই দেশে বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হোল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে কি ভাবে ভোট পাওয়া যায় সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি। যে সব নেতারা মার্ক্স্-লেনিনের নামে শপথ করতেন তাঁরাও এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা সাম্যবাদের পথিকৃৎদের পূর্বঘোষিত নীতির সঙ্গে খাপ

খায় না। অপর দিকে যারা পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন তাঁদের কথাবার্তা ও কার্য কলাপের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। আমাদের দেশের লোক বৃটিশ শাসনকালে কঠোরভাবে শোষিত হয়েছে, কাজেই সমাজতন্ত্রের কথা, সাম্যবাদের কথা সহজেই তাদের মনে ধরতো। তাই সমাজতন্ত্রের টোপ সকলেই ফেলতে লাগলেন ভোট ধরার কৌশল হিসেবে যেমন হিটলার করেছিলেন 'ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্' এর শ্লোগান দিয়ে। ভোটে জয়লাভ করে গদিতে বসে নেতাদেরও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। মন্ত্রী হয়ে দুচার বার প্লেনে ঘুরে, পাঁচতারা মার্কা গেষ্ট হাউসে থেকে আর এয়ার পোর্টে বাতানুকুল ভি আই পি লাউঞ্জে বসে কখন যেন রুচি আর মানসিক চাহিদা বদলে গেছে। দেশে সব স্তরেরই মানুষ আছে—সর্বহারাদের চেয়ে একটু কুলীন জাতের জনগণের নেতা হয়ে নিজেও কি একটু কৌলিন্য লাভ করা যায় না? কাজেই কৌলিন্যের পিপাসা শুধু ভোটদাতাদের নয় ভোট প্রার্থীদেরও আছে। অপেক্ষাকৃত কুলিন সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে মন্ত্রীরা যেমন কৌলিন্য প্রাপ্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর লোকও কৌলিন্যের লীগ কোঠায় ওপরে ওঠবার প্রয়াস পেলেন। তুলনীয় ভাবে সং বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের প্রতি নাক সিঁটকে এক শ্রেণীর লোক এক সময় চলতেন। এই মন্ত্রীদের মধ্যে আবার যাঁরা একটু কুলীন জাতের তাঁদের পেছনে ছুটতে লাগলেন এই একদার কুঞ্চিত নাসা লোকের দল যাতে বিচ্ছুরিত আলোকে একটু চকমক করা যায়। কাজেই সকলেই কৌলিন্যের পেছনে ছুটছেন—সাধারণ জনগণ, ভোট প্রার্থী নেতা এমনকি 'ইনডিফারেন্ট' লোবেরাও যাঁদের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা কোন কালেই ছিল না। শ্রেণীহীন সমাজ সারা পৃথিবীতে কবে প্রতিষ্ঠিত হবে জানি না। সমাজে একটা উঁচু জায়গা থাকবেই যেখানে সকলেই পৌছুতে চাইবেই। যাঁরা এককালে শ্রেণী-বৈষম্য তুলে দেওয়ার জন্য সোচ্চার ছিলেন পরে তাঁরাই কিছু সুবিধে ভোগের পর সে জায়গাটি আর ছাড়তে চাইছেন না।

পার্থসারথি চৌধুরীর কবিতা

দীপক রুদ্র

পার্থসারথি চৌধুরী বাংলার কবিতার ফুলে-সাজানো হাজার-ওয়াট আলোজ্বলা মঞ্চের অবধারিত অধিবাসী হননি এখনও—যদিও চুয়াল্লিশ বছরের জীবনে অন্তত তিরিশ বছর ধরে তিনি কবিতা লিখছেন, এবং এখনকার কবিতারাজ্যের অবিসম্বাদিত রাজন্যবর্গের অনেকের সাথে তাঁর আকৈশোর সখ্যতা। প্রকাশিত কবিতার বই এতাবৎ মাত্র দুটি—মৃতবৎসা সসাগরা (১৯৭২) ও উদ্দির আহ্লাদ ছেড়ে (১৯৮৩)—কবি তেমন করিৎকর্মা হলে বইয়ের সংখ্যা দশবারো হতে পারত অনায়াসে।

আসলে, কবিতা পার্থসারথির কাছে নিত্যব্যবহৃত, আবশ্যক, অথচ অবচেতন ও স্বীকৃত জীবনাংশ। উঠতে বসতে, ঘুরতে বেড়াতে, বড় হতে হতে, জাগতিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে হতে পার্থসারথি অনবরত কবিতার সঙ্গে সাবলীল প্রাত্যহিক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। শৈশব, যৌবন, পড়াশোনা, অধ্যাপনা, সরকারী উচ্চপদে দুই দশকের অবস্থান, সব পর্যায়ের টানাপোড়েন চড়াই উৎরাই তিনি কবিতাকে বুকে পিঠে নিয়ে পেরিয়ে চলেছেন। সন্দীপ, মহিষাদল, জয়পুর, কালনা, বেলপাহাড়ি, অযোধ্যা, বিজনবাড়ি—দুই বাংলার মাটি পাথর নদী গাছ পথ মানুষকে আত্মীয় অন্তরঙ্গতায় ছুঁয়েছেন দেখেছেন ও কবিতায় চিহ্নিত করেছেন তিনি। এত বছরের হর্ষবিষাদ, পাওয়া-ছাড়া, কাছে যাওয়া দূরে সরা তাঁর কবিতাকে যেমন দিয়েছে স্থিতধী উত্তরণ, তেমনি দিয়েছে অসাধারণ মমত্ব, সারল্য, ক্ষমা ও চিরায়ত আশ্চর্যবোধ।

অন্য কয়েকজনের মতো এই প্রতিবেদকেরও ধারণা, পার্থসারথির কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের প্রভাব স্পষ্ট। এই ধারণার সত্যাসত্য নির্বিশেষে, তাঁর শব্দচয়নে যত্ন, ব্যাকরণ ও আঙ্গিকে নিষ্ঠা, অলঙ্কারকুশলতা ও শালীনতা অনস্বীকার্য। কবিতা যখন ক্রমাগত স্বেচ্ছাচার অসংযমের খোলা ময়দান চোরাগলিতে পরিণত হচ্ছে, তখন পার্থসারথির মতো দু-একজন কবির সততা, মুগ্ধতা, প্রাকৃত উচ্চারণ শ্রদ্ধার দাবী রাখতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, কবিতা লেখা যে ছেলেখেলা নয়, সাম্প্রতিক দুর্বোধ্যতা ও অশিক্ষিত, অপরিশীলিত আধুনিকতাই যে কবিতার গ্রাহ্য বর্তমান নয়, এই পরিণত কবি সবিনয় তা মনে করিয়ে দেন।

পার্থসারথির কবিতা শিল্পীত, সংস্কৃত, পরিশ্রমী, এবং সেইসঙ্গে প্রায়শই আত্মবিস্মৃত। অভিজ্ঞতার বিস্তার সেখানে কোথাও উদ্ধত, রিরক্ত, প্রচারধর্মী নয়, বরং বিচিত্র হয়েও নম্র, ব্যথিত, অনুরাগী। ছন্দকবিতার প্রাধান্য পার্থসারথির রচনায়, যদিও তা তাঁর নির্বাচিত কাব্যরীতি বা মূল অবলম্বন বলে মনে হয় না। খ্যাতিপ্রাপ্ত নন্দিত অনেক কবির চেয়ে তাঁর লেখায় কাঠামোর স্বাধীনতা ও পরীক্ষাপ্রবণতা বেশি, এবং ইমেজ নির্ভরতা কম।

শেষ হিসেবে, পার্থসারথি চতুর বা কপট কবি নন, তিনি সহজেই ধরা দেন, তাঁকে খুঁজে পেতে তাঁর কবিতার পেছনের মনস্তত্ত্ব ঘাঁটতে হয় না। ঝোলা কাঁধে যে উর্দ্ধমুখ অবাক চোখ খানিক বিস্তস্ত মানুষকে বইমেলায় আউলবাউলের ডেরায় মাহাতো গ্রামে মহাকরণে ফিল্মোৎসবে আমরা সচরাচর দেখি চিনি ভালোবাসি, তাঁকে তাঁর কবিতায়ও সরাসরি আড়াল-আবডাল মুখোশ ছাড়াই পেয়ে যাই অক্লেশে।

পার্থসারথি চৌধুরীর পাঁচটি কবিতা

যুগান্ত

সঙ্ঘ আর আরামের বিরোধ লেগেছে বঙ্গে,
সংক্রামিত চারিদিকে কলঙ্কিত গাঙ্গনের কাল।
জ্যেষ্ঠ খোঁজে পথমল, অনুজ চলেছে সঙ্গে,
তল্পি ফেলে বাহকেরা তুলে নেয় বধির কর্তাল।

সঙ্ঘের সুমিতি কাঁদে, সুমতির ভেঙ্গে গেছে শাঁখা,
ফুলশেজ বিমর্দিত বিহারের যথেচ্ছ চরণে,
সমাগত বহ্নুৎসবে শুধু থাকে নভোপটে আঁকা
জীবনের মুখচ্ছবি, তারেও তো ডেকেছে মরণে।

শ্বাপদ অরণ্য ছেড়ে লবণের ধাবমান কায়া
হার্মাদশাসিত বঙ্গে রচেছিলো চন্দনের বন,
অনেক কুঠার খেলো আন্দোলিত প্রশাখার মায়া,
সুগন্ধ করেছে চুরি দেশদ্রোহী লুব্ধ মহাজন।
তবুও সঙ্ঘের দীপ্তি সমতটে ভেঙ্গেছে সবিতা;
আরাম জঞ্জাল এনে অবশেষে রচে শেষ চিতা।

বেত্রবতী

বেত্রবতী আজ দেখি লোলচর্ম জরার কবলে,
তার ন্যুব্জ দেহছায়া পড়ে আছে মৃত্তিকা-অঞ্চলে।
একদিন বৈশাখের তাপশ্রাবী আসন্ন প্রলয়
এড়ায়েছে এই দেহ, আয়ুধের বিশ্বস্ত অভয়।
অশোক রজনী তার গ্রীবাভঙ্গে নেচেছে সংযমে
পীড়িত দুধের ভাও কিনারা মেনেছে শমেদমে।
দাহের সহনশক্তি, হিমরাতে উষ্ণ আয়োজন,
ধূসরের অলক্তিকা, ভবরোগে নিত্য রসায়ন।

আজ রিক্ত নদীতীরে যুগভুক্ত মৃদঙ্গ অঙ্গারে
রুখুচুল লোলচর্ম ছন্দোহীন জরতীরে কাড়ে।
বিশ্বের তাবৎ সুধা নিয়ে গেছে খল জলযান,
শতাব্দীর পালা শেষ, বিয়োগান্ত সাশ্রু উপাখ্যান।
কুণ্ঠিত দূর্বায় রাখি শিরস্ত্রাণ কৃতজ্ঞ প্রণতি,
গম্ভীর আকাশ দেখে জরামুখে গ্রস্ত বেত্রবতী।

নাস্তিগন্ধ

শূন্যের সে সাহচর্যে একদিন কেমন ছিলাম···
রোমাঞ্চরভসে পূর্ণ শৈশবের মুগ্ধ মধ্যযাম।
তখন তো আশালতা নব ঢলোঢল,
রোমহীন পেলবের ইশারা শীতল,
মাটির অমেয় রূপ মহাকালে পাতে গৃহস্থালী,
অপাপ ললাটে লেখা চিরস্থায়ী ভবের রাখালী।

নদীজলে ভঙ্গুরতা, বৃক্ষদেহে মুমূর্ষু লাবণী,
জরাজয়ী অহঙ্কার সবেদন দেখে পলায়নী।
তারাদলে লীয়মান ত্রস্ত চঞ্চলতা,
বসন্ত পবনে চোরা বিদায়ের কথা ;
হৃদয় জাগেনি তবু উষারাগে নিকনো ভুবন,
আরম্ভেরই আয়োজন, হবে না কখনো সমাপন।

ভবের রাখালী ছেড়ে আজ জানি যেতে হবে ফিরে
অনন্ত আলোয় কিংবা সৃষ্টিবীজ অকূল তিমিরে।
প্রবেশ ও প্রস্থানের কম্পিত অলখে
ক্ষণলীলা শেষ হোল চোখের পলকে।
উৎসহীন চেতনার লভ্য নয় শেষ পরিণাম,
এমনই নাস্তির লোকে একদিন ভালোই ছিলাম।

পরিণাম অরমণীয়

তোমার বিখ্যাত প্রেম লোলচর্ম বিনয়ী হয়েছে,
বিবাগীর মিতবাক পরিণতি তার।
সে আর ধুলোর বুকে জলের ধারায়
নির্মাণের একাগ্রতা দেখাতে পারে না।
তার আঙুলের মুগ্ধ জ্বরতাপ
জানবে না নমিত মাটির পিণ্ড।

সুচারু নখের লীলা ভুলে গেছে
রেখাকীর্ণ বেদনা ও হরষের মুহুর্মুহু ছবি।
আজ হতে পঞ্চশাখ পত্রহীন ঊর্ধ্বমুখ শিলাসহোদর,
কীর্তনের মুদ্রা নয়।
অভীপ্সার থরথরি কোলাহল শেষ,
সমাধিসৌধের মৌন নেমে আসে শীর্ণতর অস্থির শিয়রে।

নাকি তোমার বিখ্যাত প্রেম পরাঙ্মুখ বিলাপী হয়েছে,
বিষয়ীর রুদ্ধবাক পরিণতি তার।
নদীতীরে অরণ্যের শ্যাম প্রেক্ষাপট
গ্রহণ করে না তারে,
স্বভাবের শিলাতলে অঙ্কুরবিহীন মজে
সমাহৃত বীজের প্রত্যাশা।
এক জীবনের আয়ু অনন্তকালের পথে
হতাশ্বাস গতাসু হারায়।
ভিত্তিহীন মৃত্তিকারহিত স্বর্গে
উদগ্র পেটিকা খুলে শেষ গোনাগাঁথা
এলোঝেলো হয়ে যায় হিম হাহাকারে
করকাপ্রপাতে।
চরাচরে এখন কি আর কোনো সুবাতাস নেই,
তোমার বিখ্যাত প্রেম অপচয়ে বিমর্ষ হয়েছে।

প্রবাসান্ত

এমন নদীর ধারে বনস্থল পাশে রেখে
দাঁড়ালে ভাবতে হয়
এখানেই আজ হোল প্রবাসান্ত, প্রবাসের শেষ।

মনে নেই কবে
এ ভূমির স্পর্শবেগ ফেলে গেছি দূরে,

কী ছিলো চলার নেশা অক্ষিতারকায়,
কেন কে ভোলায়
কৌতূহলে নবকান্ত কিশোরহৃদয়,
হবেও বা ভূপতিত উল্কার আবেগ,
নষ্ট নক্ষত্রের শেষ লুব্ধ বিচরণ।

অনেক ঘুরেছি আমি
লবণ সমুদ্র থেকে হরিৎ বিতানে,
লতার আশ্লেষ অটবীর আতিথ্য সহজ,
ধূসর পাহাড়ী মায়া, পাটকেল প্রান্তরের মধু,
এসব দেখেছি আমি মধুরাতে।
রৌদ্রময় বিরাগী দুপুরে খুঁজে নিতে গেছি
মৃন্ময় নিভৃতে নষ্ট অঞ্চলের ছায়া।

শহরতলীর পথে আলো আর আঁধারের বুকে
ফুল তুলে পাখির ডানায়
আকন্দের পরপারে শ্মশানের চিন্তিত নীরবে
কোলাহলে
শকটশাসিত পথে
জনতার ভিড়ে
অনেক হয়েছে ঘোরা।

আজ এমন নদীর তীরে
একলা দাঁড়ালে মনে হয়
প্রবাসান্ত, শান্তি, ভ্রমণের শেষ।
এ নদীর কূল জানে নবতর দেশে
জাগিবে হৃদয়।
আর মূর্খ বিচরণ নয়,
প্রবাসান্ত, প্রবাসান্ত, শুধু মনে হয়।

ব্যক্তিগত রচনা

মনুষ্য সম্বন্ধীয়

গুণানন্দ ঠাকুর

পাঠকবৃন্দের দুঃখ হইবে বলিয়া সত্যকথন তো বন্ধ করিতে পারা যায় না। তাই অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে গুণানন্দ ঠাকুর এখনো জীবিত। মধ্যে ব্রাহ্মণী কঠোর হইয়াছিলেন। আদেশ দিয়াছিলেন ছাইভস্ম লিখিবার প্রয়োজন নাই। গুণানন্দ ব্রাহ্মণীকে ভয় করিয়া থাকে, ভক্তি করিয়া থাকে। কিঞ্চিৎ ভালবাসাও যে নাই এমত কহিতে পারি না। সুতরাং গুণানন্দ লেখনী সংবরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি সম্পাদক অত্যন্ত নিরীহভাবে বলিল 'আপনার অসুবিধার কথা বুঝিতে পারি।' শুনিয়াই ব্রহ্মতেজে জলিয়া উঠিল। গৃহিণী সম্প্রতি পিতৃকুলের কয়েকটি ব্যাপারে ব্যস্ত রহিয়াছেন। লেখনীতে মসী রহিয়াছে। সর্বোপরি সম্পাদকের প্রশ্রয় রহিয়াছে। গুণানন্দকে আর কে পাইবে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে দেখিয়া গুণানন্দ বৈদ্য-জাতির সহনশীলতার উপর ভক্তিমান হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক, তুমি জাতবিচার কর না, তাই বোধহয় নাসিকাকুঞ্চন করিলে। আরেকবার ভাবিয়া দেখো। দেখিতে পাইতেও পার এই প্রগতিশীল বঙ্গদেশের পশ্চিমবঙ্গেও জাতিভেদ প্রথা আজিও চলিয়াছে।

ভুল করিও না। আমি জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে লিখিতে বসি নাই। বুড়ার কয়েকটি ক্ষুদ্র দুঃখের কথা বলিব মাত্র। সম্পাদককে কথা দিয়াছি রাজনীতি লইয়া কোন কথা কহিব না। কেহ যদি আদরণীয়া ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তিসূর্য বলিতে চাহেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে তাঁহাকে বাধা দিবে কোন ব্যক্তি?

অনুরূপভাবে কেহ যদি অনাদর করিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া অভিহিত করে যে সংবিধান দাহ করিতে কেহ কেহ ব্যাকুল সেই সংবিধান তাহাদের সেই স্বাধীনতাও দিয়াছে। অন্যদিকে কেহ যদি জ্যোতির্বলয় লইয়া মাতামাতি করিতে চাহে তাহার সম্বন্ধেও গুণানন্দ কোন অভিযোগ করিবে না। আমাদের রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নানারূপ অনর্থের কারণ বলিয়া যাঁহারা ভাবেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক। গুণানন্দ অশোকবাবুর সাহিত্যচিন্তার গুণগ্রাহী। আমাদের অর্থমন্ত্রী যথার্থ ভদ্রলোক। যদিও, সংবাদপত্রে দেখিয়াছি এই প্রশ্নে তুলকালাম হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু গুণানন্দের মন নানা কারণে ভারাক্রান্ত। সম্প্রতি একটি পুষ্পের ন্যায় শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড গুণানন্দকে ব্যথিত করিয়াছে। পুত্রহারা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের জানা নাই। তাহাকে শুধু বলিতে পারি, মাতা তোমার দুঃখ সকল বাঙালী ভাগ করিয়া লইয়াছে। তুমি তাহাতে সান্ত্বনা পাইবে না তবু তোমাকে এই কথাটি জানাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু মাতা যাদে অন্যদের সম্বন্ধে কি বলিব? বাংলার রাজনীতি আজ এমন এক পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে যেখানে রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষের মৃতদেহ লইয়া আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিয়া থাকে। কয়েকমাস পূর্বে এক কবির মৃত্যুর পর কোন একটি রাজনৈতিক দল তাঁহার মহার্ঘ শবদেহটি চাহিয়াছিল। তাহাদের প্রাণে বড় আনন্দ হইয়াছিল এইবার কবির মৃতদেহটিকে মূলধন করিয়া আসর জমাইবে। কবির সহধর্মিণীর দৃঢ়তায় তাহা হইতে পারে নাই। কারণ কবির দীর্ঘ বেদনাদায়ক অসুস্থতার সময় মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে আর কাহারও শিরঃপীড়া ছিল না কবির জন্য। সহধর্মিণী অসাধারণ ধৈর্যের সহিত তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। অন্য আরেকদল এই শিশুটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আসরে খোল করতাল লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। ভুল করিবেন না, এই শিশুটির মৃত্যু লইয়া দোহারকীরা যাহা বলিতেছে তাহা সম্বন্ধে গুণানন্দর কোন আপত্তি নাই। যে শিশুহত্যা করে সে ঘৃণ্য। যে সেই শিশুহত্যাকারীকে সমর্থন করে সে-ও ঘৃণ্য॥ সুতরাং দোহারকীরা যাহা বলিতেছে তাহার সহিত দ্বিমত হইবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বৃহত্তর একটি প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। এই সঙ্গে প্রশ্নটি না করিলে অধর্ম হইবে। গুণানন্দ দেখিয়াছে আমাদের বঙ্গজননী ক্রমে গুণ্ডা-কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছেন। এই গুণ্ডাদলকে আর কোনো নামেই অভিহিত করা

সম্ভব নয়। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেও গুণ্ডার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক নেতারা গুণ্ডানির্ভর ছিলেন না। অদ্য গুণ্ডারাই রাজা। মন্ত্রিসভা হইতে সুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া আমাদের পরিবারসমূহের মধ্যে তাহারা রাজত্ব চালাইতেছে। ইহা এক অসম্ভব অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। এই পার্টি একদিন জনগণমন-অধিনায়ক রূপে বিরাজ করিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পুণ্যলগ্নে যে স্বাধীনতার পতাকা আকাশে উড্ডয়ন করা হইয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসেরই পতাকা ছিল। যে পতাকা ভারতীয় পতাকা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি সেই পতাকাও কংগ্রেসের পতাকারই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত সংস্করণ। অথচ সেই দলের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহারা কি প্রকারের মনুষ্য (?) তাহা সর্বজনবিদিত। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অতি সজ্জন ব্যক্তি। তিনি কর্মদক্ষ, সৎ এবং তাঁহাকে লইয়া আমাদের গর্বের সীমা নেই। তবু কেন আমরা তাঁহার মুখ হইতে প্রায়ই শুনিতে পাই তাঁহার দলের সন্তানদের দিয়া তিনি মূর্খদের শিক্ষা দিবেন? এই সন্তান কাহারা? হানাহানিতে পারদর্শী কিছু অপরিণামদর্শী যুবক নয় কি? আমেরিকায় যেরূপ গুণ্ডাদের মধ্যে বখরা লইয়া লড়াই চলে এখানেও তো তদ্রূপ লড়াই চলে। সেই লড়াইএ যাহারই মৃত্যু হয় সে-ই শুনিতে পাওয়া যায় শহীদ হইয়া গিয়াছে। গুণানন্দ 'শহীদ' কথাটির অর্থ অন্যরূপ শিখিয়াছিল। গুণ্ডাদের যুদ্ধ কিভাবে রাজনৈতিক যুদ্ধে পরিণত হয় সে তথ্য গুণানন্দর বুড়া এবং স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না। তবু গুণানন্দ দেখে সর্বজনের ভীতিপ্রদ কোন গুণ্ডাকে লইয়া বৃহৎ মিছিল বার হয়। দোকানীকে পসার উঠাইতে হয়। যে পরিবহন ব্যবস্থা নিত্যই পর্যুদস্ত তাহা আরও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহা কোন একটি বিশেষ দল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

বঙ্গদেশের বড় গুণগান শুনা যায়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রত্যেকে অতি সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কেহই প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিতেছেন না। আমাদের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দারিদ্র্যের মধ্যেই শেষজীবন কাটাইয়াছেন। আমাদের মন্ত্রিসভার প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের মধ্যেও বেশীর ভাগ সদস্যই সৎ এবং সজ্জন। তবু কেন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি এইরূপ অসহায়ের ন্যায়

গুণ্ডাহস্তে নিজেদের সমর্পণ করিল? আর বাংলাদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কী করিয়াছে? তাহারা বিপ্লব কয়টা স্টেশন পার হইল তাহার খোঁজ করিয়া চলিয়াছে। অদ্য কলিকাতার বিভিন্ন অংশে নাগরিক সমিতি গজাইয়া উঠিতেছে। গুণানন্দ ইহাকে স্বাগত জানাইতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কিরূপ যেন বেসুরো ঠেকিতেছে। কাহাদের গলা শুনিতে পাইতেছি! তাহারাই তো ১৯৫০এর দশকে ট্রাম-বাস পোড়াইবার চেষ্টাতে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের বোধকরি মনে হইয়াছিল ট্রাম-বাস পোড়াইয়া জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানাইতেছে। মূর্খকে জাগ্রত করার চেষ্টা বৃথা। নহিলে কহিতাম গুণ্ডার কোন জাতি নাই। গুণ্ডা গুণ্ডাই। ১৯৫০এ যাহারা ট্রাম-বাস পোড়াইয়াছিল তাহারা গুণ্ডা ছিল। আজ যাহারা পোড়াইতেছে তাহারাও গুণ্ডা। সেদিন তাহারা বিপক্ষ দলের, বর্তমানে যাহারা শাসকদল, তাহাদের মদত পাইয়াছিল। আজ তাহারা বিরোধীপক্ষ হইতে মদত পাইতেছে। বিধাতার করুণ পরিহাসে সেদিনের শাসক দল আজ বিরোধী দল। গুণানন্দ উভয় পক্ষকে ধিক্কার দিতেছে।

সমাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য প্রয়োজন নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা। নিয়ম ভগবান তৈয়ারি করেন নাই। আমরাই করিয়াছি। সে আইন বদলাইবার প্রয়োজন হইলে বদলাইতে হইবে কিন্তু তাই বলিয়া আইনবহির্ভূত কোন ব্যক্তির হস্তে আইন তুলিয়া দেওয়া যায় না। কিছু লোক একত্র হইয়া চাহিলেই সে কর্ম আইনসম্মত হয় না। শিশুহত্যাকারীকে চরম দণ্ড দেওয়া হউক এ কামনা সমস্ত জনের। গুণানন্দ তাহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু এতদিন ধরিয়া আমরা দেখিয়াছি অর্থ থাকিলে হত্যাকার্য করিয়াও বহাল তবিয়তে বাঁচা সম্ভব। আইনের কাজ এদেশে দীর্ঘসূত্রী হইয়াছে। আদালত যাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে সে উচ্চতর আদালতের শরণাপন্ন হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে। ইহাতে মানুষের ক্রোধ স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলিবেন না, সহজ এবং তাৎক্ষণিক বিচারপদ্ধতির ফলস্বরূপ একদিন ডাইনী পোড়ানো হইত। সক্রেটিসকে যাহারা হেমলক খাইতে বাধ্য করিয়াছিল, গালিলেওকেও যাহারা কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহারাও জনগণের এরূপ অসহিষ্ণুতার সুযোগ লইয়াছিল। সুতরাং আইন যাহাতে তাহার নিজস্ব পথে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অভিযুক্তদের তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যবস্থা করিতে দিতে হইবে। উচ্চতম আদালতে দোষীরা যাহাতে যথোচিত শাস্তি পায়

তাহার জন্য ব্যবস্থা লইতে হইবে। তাহা না হইলে অন্য একটি মামলায় বধূ হত্যার আসামী যেরূপ সমাজের বুকের উপর বসিয়া রাজত্ব করিতেছে, সেইরূপ ইহারাও আইনের সূক্ষ্ম বিচারে ছাড়া পাইয়া যাইবে।

সর্বোপরি চিন্তা করা প্রয়োজন কেন আমাদের পুত্রকন্যাগণ বিপথে চলিয়াছে। মানুষের প্রাণের মূল্য কেন তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। কেন তাহারা পাপবোধ হইতে মুক্ত। গুণানন্দ তাহার চক্ষু দুইটি দিয়া যাহা দেখিতে পায় তাহা দিয়া বিধাতার সৃষ্ট সৌন্দর্য দর্শন করিতে চাহে। তাই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু গুণানন্দর কর্ম এখনো ঠিক আছে। সুতরাং সে যাহা শুনে তাহা হইতে অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে বর্তমানে যে প্রকার চলচ্চিত্রের অধিক জনপ্রিয়তা তাহাতে পীড়নের আধিক্য। দূরদর্শনের কৃপায় তাহা আজ আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু গুণানন্দ হতাশ নহে। মনুষ্যত্বের ক্ষীণ আলোটুকু দেখিলেই সে উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতে প্রস্তুত। এবং এই শিশুহত্যার মধ্যেও গুণানন্দ দেখিয়াছে মানুষ আজিও বাঁচিয়া আছে। সেই যে প্রৌঢ় যে কোটালকে লইয়া স্বয়ং গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল স্বীয় সন্তানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং তাহাকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গুলি তুলিয়া কহিয়াছিল 'এই সেই ব্যক্তি যাহাকে আপনারা খুঁজিতেছেন,' সেই ব্যাক্ত মানুষ। তাহার ভিতরই মনুষ্যত্ব এবং ভগবান প্রকাশমান। এবং এই ধরনের বিশুদ্ধ মনের মনুষ্যদের জন্যই গুণানন্দ তাহার অখণ্ড পরমায়ুর জন্য ব্যথিত হয় না। মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সে কৃতার্থ।

প্রবন্ধ

কী করে হলদিয়া হলো

নির্মল বসাক

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক চমকপ্রদ আবিষ্কারের মত হলদিয়াও হঠাৎ করেই আবিষ্কার হয়েছিল। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স অধুনা পোর্ট ট্রাষ্ট-এর একটি বাংলো ছিল হলদিয়াতে হলদি নদীর পারে। হলদি নদী যেখানে গঙ্গার সাথে মিলেছে তার কাছেই। হলদিয়া তো একটি গণ্ডগ্রামই ছিল। সামনে বিশাল গঙ্গানদী যার এপার ওপার প্রায় দেখাই যায় না, আর পাশে এই ছোট হলদি নদী যার ওপারে অপার শস্য-ক্ষেত্র। চোখ ফেরালে নীল জল আর সবুজ মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এই বেশে পোর্টের বাংলোটি যেন রাজপুরী। তারিফ করতে হয় কর্মকর্তাদের। পোর্ট ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত জাহাজকে নিরাপদে আনবার জন্য জলপথ ঠিক রাখতে হয়। নদীর সব জায়গা তো জাহাজ চলাচলের মত গভীর নয়। প্রতি বছর গঙ্গা-যমুনা ধৌত বালি পলি হয়ে জমে যাচ্ছে ফরাক্কা থেকে সাগর মোহনা অবধি। এই বালি কেটে সরিয়ে জাহাজ চলাচলের চ্যানেলটি ঠিক রাখার দায়িত্ব ইঞ্জিনীয়ারদের। তাঁদের মাঝে মাঝেই যেতে হয় জলযানে করে সাগর মোহনা অবধি। রাত বেশী হয়ে গেলে তাঁরা আর সেদিন কলকাতায় ফেরেন না, ঐ বাংলোতে রাত কাটান। সেজন্যই তৈরী হয়েছে ঐ সুন্দর বাংলোটি সুন্দর পরিবেশে।

ইদানীং তো গঙ্গার বুকে পলি পড়ছিল ভীষণ। হুগলী নদীর স্রোত যাচ্ছিল মন্দা হয়ে। চ্যানেলটি কাটিয়ে ঠিক ততটা গভীর করা যাচ্ছিল না

যতটা গভীর করলে বড় বড় জাহাজ আসতে পারে কলকাতা পর্যন্ত। খুবই চিন্তায় পড়েছিলেন পোর্টের বড় সাহেবরা। এমনি একসময় এক রাতে এই বাংলোতে থাকতে এলেন কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান। সকালে বেড়াতে বেড়িয়ে তাঁর মনে হল জায়গাটা তো বেশ। যেমন সুন্দর তেমনি নতুন একটি বন্দরের পক্ষে খুবই উপযুক্ত জায়গা। এখানে একটি বন্দর তৈরী করতে পারলে ভাল হয়। এই হল হলদিয়া বন্দরের অঙ্কুর। ফরাক্কা বাঁধ হয়েছে, জল আসছে, সে জলে বালি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গভীর সাগরে ঠিকই। কিন্তু তাও বড় জাহাজের পক্ষে কলকাতা আসা কিছু কঠিন। আর হলদিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত চ্যানেল ঠিক রাখতে যে টাকা খরচ হয় প্রতি বছর, তাও তো কম নয়। পাঁচ বছরের এই টাকা দিয়েই তো একটা মাঝারি রকমের আধুনিক বন্দর গড়া যায়। তার ওপর বাংলা-দেশের সাথে চুক্তি হলে কলকাতা তথা হলদিয়া বন্দর ৪০,০০০ কিউসেক জল বছরের সব ঋতুতে পাবে কিনা তাও সন্দেহ। এইসব চিন্তার ফসল কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রত্যন্ত জলজ প্রান্তরে হলদিয়া বন্দর রূপে উঠে এল বাংলার লক্ষ্মীমন্ত উঠোনে। বাংলার এই অঞ্চলে বন্দর প্রকল্প কোন নতুন কথা নয় অবশ্য। সেই সুদূর অতীতে এই বন্দর থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে রূপনারায়ণ নদীর তীরেই ছিল বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্ত অধুনা যার নাম তমলুক।

কলকাতা-বন্দর কর্তৃপক্ষের কলকাতার কাছাকাছি একটি সাহায্যকারী নতুন বন্দর প্রকল্পের জন্য সেই দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা রূপায়ণের আমলেই এতো মাথা ব্যথা হল দুটি কারণে। ভারতবর্ষ ঠিক করল আমাদের যত খনিজ সম্পদ আছে, তার যে অংশ আমরা ততটা কাজে লাগাতে পারছি না তাই বিক্রি করে দেব অন্য দেশের কাছে, তাতে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা আসবে। এই কাঁচা খনিজ পদার্থের মূল ক্রেতা হল জাপান। আর এই যে খনিজ পদার্থ তার উৎপত্তি স্থল তো পূর্বভারত অর্থাৎ মুখ্যত বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা। এ অঞ্চলে তো সত্যিকারের বন্দর একমাত্র কলকাতা। অথচ কলকাতার উপর এমনিতেই যে চাপ তার ওপর এই বাড়তি চাপ পড়লে কলকাতা বন্দরের 'ট্র্যাফিক-সিস্টেম' বিপর্যস্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ জাহাজের ভীড় আর ভীড়, মোহনায় আটকে যাবে জাহাজ, নদী-মোহনায় থেমে থাকবে জলযান। ডক ভর্তি হয়ে গেলেও মাল খালাস করতে হিমসিম খেয়ে যাবে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি। এতো মাল রাখারও তো তেমন জায়গা নেই। আর নতুন গুদাম-

ঘর বা ইয়ার্ড তৈরী করার জন্য কে দেবে জায়গা ছেড়ে এই কলকাতাকে! সুতরাং এখনই নতুন বন্দর চাই। আর একটা মস্ত বড় কথা, এই টন টন মাল জাহাজে ভর্তি করতে বা জাহাজ থেকে খালাস করতে যদি শুধুমাত্র লোকেরই সাহায্য নিতে হয়, তাহলে অনেক অনেক সময় লাগবে, ব্যাপারটা লাভজনক হবেনা। আবার ঐ সময়ের মধ্যে প্রচুর মাল নিয়ে এসে যাবে লরীর পর লরী, ওয়াগনের পর ওয়াগন। অথচ যান্ত্রিক উপায়ে যদি জাহাজে মাল ভর্তি করা যায়, যদি মাল খালাস করা যায়, এক দশমাংশ সময়ও ব্যয় হবেনা তাতে। দ্রুত কাজ হবে; লাভ হবে। উন্নতি হবে কলকাতা বন্দরের। তাই হুগ্লে হয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুন জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে সুন্দর করে সাজানো যায় মাল ভর্তি, মাল খালাসের যন্ত্রপাতিগুলো। এক একটা ঘাট (বার্থ) থাকবে এক এক রকম জিনিসের জন্য। কোনটা হবে আইরণ-ওর-বার্থ, কোনটা কোল-বার্থ, কোনটা বা হবে ফসফেট-বার্থ ইত্যাদি। কোন ঘাটে মাল উঠবে কোন ঘাটে মাল নামবে, সব কাজ হবে যন্ত্রে। শুধু শ্রমিকেরা ওয়াগন থেকে মাল ঢেলে দেবে 'হপারে'। সেখান থেকে যান্ত্রিক উপায়ে মাল চলে যাবে জাহাজের খোলে স্বয়ংক্রিয় অর্থাৎ 'অটোমেটিক' পদ্ধতিতে। তেমনি মাল নেমে আসবে জাহাজের থেকে অটোমেটিক কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে, পৌঁছে যাবে গুদামের জায়গামত। দুচারজন সাহায্যকারী লোক দরকার হবে মাত্র। বন্দরে জাহাজ ভিড়ে থাকবে কম সময়,'লাভ হবে তাতে বন্দর কর্তৃপক্ষের, লাভ হবে পশ্চিমবঙ্গের, লাভ হবে ভারতের। যদি নির্দিষ্ট দিনের পরেও জাহাজকে বন্দরে, নদী-মোহনায় বা সাগর-সঙ্গমে জায়গার অভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তবে বন্দর কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় জাহাজের মালিককে। তাতে বন্দরের লোকসান হয়। তাই বন্দর কর্তৃপক্ষের কি করা যায়, কি করা যায় ভেবে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছিল। ওদিকে অন্য রাজ্যও তো বসে নেই। পূর্বাঞ্চলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল আরো দুটি বন্দর যারা কলকাতার পশ্চাদ্‌ভূমিতে (Hinter land) কামড়টা বেশ জোরেই লাগাচ্ছিল। তারা ইতিমধ্যেই কলকাতার প্রতিপত্তি অনেকটা খর্ব করেছে। সে দুটি বন্দর হল, অন্ধ্রের ভিজাগাপট্টম ও উড়িষ্যার পারাদীপ

আরো একটা ব্যাপারে বন্দর কর্তৃপক্ষ সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তা হল তৈলবাহী জাহাজ পরিবহনের সমস্যা। কলকাতা তো সমুদ্রের থেকে অনেক খানি ভিতরে। পলির কথা আগেই বলা হয়েছে। নদীর নাব্যতার কথাও।

আবার এই সব নদী এত বাঁক খেয়েছে যে স্রোত গিয়েছে কমে। এদিকে তৈলবাহী জাহাজগুলি হয় প্রকাণ্ড। ঘুরতে ফিরতে লাগে অনেক জায়গা। কম জলে আসতে পারেনা, ভিড়তে পারেনা যেখানে সেখানে। ভারত সরকার এই সব সমস্যার কথা ভেবে কলকাতার কাছাকাছি কোন তৈল শোধনাগার নির্মাণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বন্দর কর্তৃপক্ষকে তো অনেক দিকই চিন্তা করতে হয়। প্রথমে তাঁরা চিন্তা করলেন ফরাক্কা প্রকল্পের কথা। ওখান থেকে যদি ৪০,০০০ কিউসেক জল পাওয়া যায়, মাঝারি ট্যাঙ্কার অন্তত কলকাতা বন্দরে ঢুকতে পারবে। কিন্তু বড় ট্যাঙ্কার তো নতুন বন্দর স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হবেই। আর এই ৪০,০০০ কিউসেক জলে ভাগীরথীর যে নাব্যতা থাকবে, তাতে ভাগীরথী বা হুগলী নদীর উপরেই তৈরী করা যাবে নতুন বন্দর। সুতরাং সেদিন ভেদিয়া নামক গণ্ডগ্রামের সুন্দর বাংলোতে সুপ্রভাত হল বন্দর কর্তৃপক্ষের। স্বপ্ন থেকে জেগে তাঁরা কাজে লেগে গেলেন। কলকাতার কাছে তৈল-শোধনাগার তৈরী করতে বাধা কোথায়? বাইরে থেকে 'ক্রুড' অয়েল এনে রিফাইন্‌ড করা যাবে এখানে সহজেই। তৈল ওঠা-নামাও এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ হবে। বন্দরের আয় বাড়বে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

প্রথমেই হলদিয়া বন্দরে হুগলী-নদীর ওপর তৈরী হল 'অয়েলজেটি,' ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। আগষ্ট মাসে যেদিন জাহাজে তেল ওঠানো হল, সে দিনই বন্দরটির উদ্বোধন হলো বলা যেতে পারে। এই যে তেলের জেটি, এটি কিন্তু আধুনিক, অত্যাধুনিকও বলা যেতে পারে। এ জেটি, দৈর্ঘ্যে ৩০০ ফুট, তার দুধারে দুটি 'মুরিং ডলফিন' যা স্থিতি-স্থাপক বস্তুতে তৈরী যাতে জাহাজের ধাক্কায় পাড় বা জাহাজের কোন ক্ষতি না হয় এবং জাহাজগুলোকে সুন্দরভাবে জেটিতে ভেড়ানো যায়। এই যে জেটি, এখানে ৮৭৫ ফুট লম্বা তৈলবাহী জাহাজকেও ভেড়ানো যায় যার নিজস্ব ওজন ৮৭০০০ টন। কম নয়। পৃথিবীর বড় বড় ট্যাঙ্কারগুলো এই ধরনেরই হয়ে থাকে। এই যে অয়েলজেটি এর সাথে সরাসরি যোগ আছে বারাউনি তৈল-শোধনাগারের। তখন তো হলদিয়াতে তৈল-শোধনাগার হয়নি, তাই এই ব্যবস্থা। হলদিয়ায় তৈল-শোধনাগার যখন তৈরী হল, তখন হলদিয়ার তৈল ও তৈল থেকে জাত দ্রব্যাদি (by-product) আমদানী রপ্তানীর কাজেই

ব্যবহৃত হতে লাগল এই জেটি। সাধারণতঃ এই জেটি ব্যবহৃত হয় কেরোসিন তেল আমদানীর জন্য এবং মোটর স্পিরিট, ন্যাপথা ইত্যাদি তৈলজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করার জন্য। এই জেটির ডান ধারে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট জেটি তৈরী করা হয়েছে, মূলতঃ হলদিয়া তৈল-শোধনাগারের তৈরী জিনিস যা শুধু বিদেশেই রপ্তানী করা হবে তার জন্য। হলদিয়া বন্দরের উদ্বোধন হয়ে গেল নদীর ওপর জেটি নির্মাণ করে। এ হল রাজ্যপাল বা মন্ত্রীর পাইলট কারের মত। এটি বন্দর নয়, বন্দরের পাইলট কার। বন্দর তবে কী? আসুন দেখা যাক ব্যাপারটা। প্রবন্ধটি লিখতে লিখতে খবর এল, ভারত সরকার ১৯৮২-৮৩ র জন্য কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের উন্নতির জন্য খরচ করেছেন ৮৭ কোটি টাকা। এর থেকে একটা বড় অংশ ব্যয় হয় হলদিয়ায় আর একটি অয়েলজেটি তৈরী করতে। বর্তমান অয়েলজেটি' দুটিরই আশেপাশে নতুন জেটিটি হুগলী নদীর ওপর। এর অর্থ তেল আমাদের এই অঞ্চলের ভাগ্য ফেরাচ্ছে। এই অর্থব্যয় আরো অর্থ আমদানী করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক, বন্দর কাকে বলে, ব্যাপারটা কী? বন্দর হল এমন একটি জায়গা যেখানে জাহাজ ভিড়বে, নিরাপদে থাকবে, জাহাজ থেকে দ্রুত মাল ওঠানামা করবে, যেখানে দরকারমত জাহাজের মেরামতি করা যাবে এবং তারপর জাহাজ নিরাপদে পাড়ি জমাবে গভীর জলপথ বা সমুদ্রের ভিতর দিয়ে অন্য কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে। ওপরে যে অয়েলজেটির কথা বলা হল, সেখানে জাহাজ ভিড়তে পারে, মালও দ্রুত ওঠানামা করতে পারে, তবু একে ঠিক বন্দর বলে যায় না। কেন? এখানে এখন পাশাপাশি দুটি কেন তিনটি জাহাজ নোঙ্গর করতে পারবে, তবু একে পুরোপুরি বন্দর বলতে পারা যাচ্ছে না। ফ্লেক্সিবল পাইপ ব্যবহার করে তেলভরা বা খালাসের কাজ দ্রুত করা যাচ্ছে, অন্য কিছু মাল আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এ দ্রুততা থাকতো না। অত্যাধুনিক মাল ভরবার বা মাল খালাস করবার যন্ত্রপাতি দিয়ে তো নয়ই, সাধারণ পোর্ট ক্রেন দিয়েও নয়। ব্যাপারটি নিহিত আছে জলের উপরই। আসল ব্যাপার হল সমুদ্র-বন্দর বা নদী-বন্দর তৈরী হলেও তা তৈরী হয়ে ওঠে সমুদ্রের কাছাকাছি, যেখানকার জলে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। জোয়ারে যখন জল বেড়ে যাবে, জাহাজ ভেসে উঠবে উপরের দিকে, আবার ভাঁটায় সেই জাহাজই নেমে যাবে নীচুর দিকে। সাধারণ জিব ক্রেন দিয়ে বা মাল

ওঠানো নামানোর যন্ত্রপাতি সমষ্টি (যা বসান হয় বন্দরের ধারে ডাঙ্গায়,) দিয়ে জাহাজ থেকে মাল খালাস বা ভর্তি করার ব্যাপারে কত অসুবিধা হয়। জাহাজের ঠিক জায়গায় ক্রেন বা যান্ত্রিক ব্যবস্থা পৌছবে না বা জাহাজের গায়ে ঠেকে যাবে যথাস্থানে পৌছাবার আগেই, কারণ জোয়ার-ভাঁটায় জল তো অন্ততঃ ২০ ফুট ওঠানামা করছে। এই অসুবিধাতেও ঠিকমত মাল খালাস করা যায় একমাত্র 'লেভেল-লাফিং ক্রেন' দিয়ে, যার খরচ ক্রেন থেকে অনেক বেশী পড়ে। বিশেষ মাল ওঠানো-নামানোর জন্য যে যন্ত্রপাতি সমষ্টি (Machinery Complex) বসানো হয়, তা দিয়ে জাহাজের যথাস্থান থেকে মাল ওঠানো বা জাহাজের যথাস্থানে মাল পৌছানো সম্ভব নয়। এই মেশিনারী-কমপ্লেক্স-এর বদলে লেভেল-লাফিং ক্রেন বসিয়ে অত দ্রুততা আসবে না যতটা আসবে ঐ বিশেষ মেশিনারী সিষ্টেমের সাহায্যে। সুতরাং এই ওঠা-নামা দেরী করার সমস্যাটির একটা সমাধান দরকার।

বন্দরের জাহাজ নিরাপদে থাকবে। এই নিরাপদ কথাটা ভাল করে লক্ষ্য করুন। জাহাজ বন্দরের ৫।৭ মাইলের মধ্যে এলেই দায়িত্ব এসে অর্শাবে বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর। বন্দরের পাইলটকে পথ চিনিয়ে জাহাজটিকে চালিয়ে নিয়ে বন্দরে ভিড়াতে হবে। এ দায়িত্ব বন্দর কর্তৃপক্ষের। এর মধ্যে যদি ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়, তার ভরতুকি গুণতে হবে বন্দর-কর্তৃপক্ষকেই। কলকাতা বা হলদিয়া বন্দরের উদ্দেশ্যে যখন জাহাজ সমুদ্র মোহনার 'স্যাণ্ডহেড' পয়েন্টে এসে উপস্থিত হয়, এখানকার বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলট জাহাজ পাঠিয়ে দেন। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা কোন কিছুর জন্য দেরি হলে ক্ষতিপূরণ করে বন্দর, এটাই আন্তর্জাতিক নিয়ম। হয় তো আপনাদের মনে থাকতে পারে, বেশ কিছু বছর আগে বাটার কাছে একটি জাহাজ চড়ায় আটকে গিয়ে আস্তে আস্তে ডুবে গিয়েছিল। ভাবুন তো ব্যাপারটা! লেক বাঁচলো কিন্তু জাহাজটি তো অকেজো হল, যে উদ্দেশ্যে যাত্রা তার কিছুই হল না। উপরন্তু জলপথের গভীর চ্যানেলে জাহাজটি বসে গিয়ে, অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্য, অন্যান্য জাহাজ চলাচলের পথ বন্ধ করে দিল। ভাবুন তো কত লোকসান। এই মরাগঙ্গায় একটা তরতাজা জাহাজ ডুবে গেল, ভাবতে অবাক লাগে না? কিংবা ভাবুন তো, ঝড়ে কলকাতা বন্দরের এতটা নিরাপত্তার মধ্যেও জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি লেগে জাহাজ দুটির কিংবা তিনটির এমন কি চারটির ক্ষতি হল। এ ক্ষতিপূরণ করতে হবে

বন্দর কর্তৃপক্ষকেই। এসমস্ত ব্যাপার তো মাঝেমাঝেই হচ্ছে। অসাবধানতায় আগুন লেগে গেল, ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে! সুতরাং নিরাপদ কথাটা আমাদের একটু বেশি করেই ভেবে দেখতে হয় বৈকি।

যথাযথ নিরাপত্তার জন্য দরকার একটা লেক তৈরী করা, একটা বিরাট লেক। তার চারপাশে জাহাজ নোঙ্গর করার ব্যবস্থা থাকবে। জেটি বলুন, বার্থ বলুন, যাই বলুন, তার ব্যবস্থা করাও দরকার। কি মাল ওঠানামা করাবেন সেই মত এক একটি 'বার্থ' ঠিক করুন, কিভাবে মাল ওঠানামা করাবেন—ক্রেন দিয়ে, অভিনারী পোর্ট-জিব ক্রেন দিয়ে, না কোনো mechanised system-এ, সব ঠিক করুন। যে মাল জাহাজে উঠবে বা জাহাজ থেকে নামবে, তার জন্য গুদাম তৈরী করে রাখুন অতি দূরে; ক্রেনই হোক বা অন্য কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থাই হোক, যেখান থেকে মালটা ওঠানামা করানো হবে, সেখানে ফাঁকা জায়গা বা ইয়ার্ড রাখুন যেখানে মালগুলো অস্থায়ীভাবে জমা করে রাখতে পারা যায়। সেখান থেকে গুদামে যাতায়াতের জন্য রাখুন দ্রুত চলাচল করার মত ছোট, বড় ও মাঝারি লরী, ট্রাক ও ফর্ক-লিফট। গুদাম থেকে ইয়ার্ডে মাল নিয়ে যাওয়া ও মজুদ করার জন্য ফর্ক-লিফট খুব কার্যকর। অত্যন্ত কম সময়ে মাল নিয়ে দ্রুত গুদামজাত করে পর পর সাজিয়ে রাখতে এর আর জুড়ি নেই। বন্দরের বাইরে মাল নিয়ে যাওয়া বা বন্দরে মাল নিয়ে আসার জন্য লরী বা ট্রাক যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনি ভিতরে রেল ইয়ার্ড ও ডকের প্রয়োজন। এই ডকের একটি বার্থ থেকে আর একটি বার্থের মধ্যে বেশ ফাঁকা জায়গা চাই, যাতে জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকির সম্ভাবনা না থাকে, ঝড়ে, আগুনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে। এই ফাঁকা জায়গাটা আরো দরকার যদি মাল চলাচল হঠাৎ বৃদ্ধি পায় তার মোকাবিলার জন্য, যেমন যুদ্ধের সময়ে বা দেশের এমন কি বিদেশের কোন দুর্গত অঞ্চলে সাহায্য পাঠানোর সময়ে। চারধারে আরো ফাঁকা জায়গা রাখুন, ভবিষ্যৎ দরকারের জন্য। কোনো বিশেষ মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য যদি ভবিষ্যতে দরকার হয়। ভবিষ্যতে কী দরকার হতে পারে, তা আজ কেউ ভেবেও ভাল করে বলতে পারে না; কারণ এক একটা পোর্ট বা বন্দর এক একটি জাতির জীবনে কতদিন যে প্রাণ সঞ্চালন করতে পারবে তা ভাবা খুবই মুস্কিল। সেজন্য যতটা সম্ভব ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রেখে এগুলো সাজানো দরকার। ব্যস, এইবার চারপাশটা একটু উঁচু প্রাচীরে ঘিরে দিন।

তার উপরে লাগান কাঁটাতার। হয়ে গেল বন্দর। কিন্তু আসল জিনিসই যে হল না।

এইবার সেই আসল জিনিসটিকে বোঝা যাক। লেক কাটলেন, বার্থ তৈরী করলেন, ক্রেন বসালেন, রেল লাইন পাতলেন, ইয়ার্ড তৈরী করলেন, গুদাম ওঠালেন। আধুনিক লোডিং, আনলোডিং টাওয়ার ক্রেনও দু-একটা বসিয়েছেন, দরকার মত লেভেল-লাফিং ক্রেনও দু চারটি। বিশেষ বিশেষ মাল ওঠানো ও খালাস করার জন্য অল-মেকানাইস্‌ড্‌ সিষ্টেম সব ঠিক আছে। এখন সমুদ্র বা নদীর সাথে লেকের যোগাযোগ করে দিন একটা খাল কেটে। জলে ভর্তি হয়ে গেল লেক। কিন্তু ব্যাপারটা তো প্রায় একই রইল। শুধু জাহাজের নিরাপত্তা কিছুটা বাড়ল। খোলা সমুদ্রের ঢেউ বা ঝড়ে বিক্ষুব্ধ নদীর জলের আঘাত থেকে জাহাজ কিছুটা নিরাপদ হল। কিন্তু আসল ব্যবস্থা তো হল না। এখনও সমুদ্রে বা নদীতে যখন জোয়ার, লেকেও তখন জোয়ার। সেখানে যখন ভাঁটা, এখানেও তখন ভাঁটা। জলের উচ্চতার সাথে জাহাজগুলো সেই উঠবে উপরের দিকে। ভাঁটায় আবার নেমে যাবে বিশ ফুট। তাহলে তো বিশেষ কিছুই সুরাহা হল না।

তাহলে কি করা যায়? ঐ যে খাল যাকে বলা হয় 'লক', তার মুখে যদি গেট বসিয়ে দেওয়া যায় ব্যস্, আটকে যাবে সমুদ্র বা নদীর জল। লেকের জলকে আমাদের ইচ্ছামত একই লেভেলে রাখা যাবে। জাহাজের লেভেল আর ওঠানামা করবে না! মাল খালাস করতেও আর অসুবিধা হবে না। না, হল না কিন্তু। লেকের জলের লেভেলের সাথে এখন সমুদ্র বা নদীর জলের কোন সম্পর্ক নেই, এটা ঠিক। সমুদ্র বা নদীতে ইচ্ছামত জোয়ার ভাঁটা খেলুক, আমরা মাল ওঠানামা করাতে পারবো। কিন্তু মোহনায় যে লাইন দিয়ে জাহাজ আটকে আছে বন্দরে ঢোকার জন্য এবং যে জাহাজ লেকের বিভিন্ন বার্থে মাল খালাস করে ফেলেছে সেগুলোও যে এবার বেরিয়ে যেতে চায়। পুরনো জাহাজগুলো বার করে দিয়ে, নতুন জাহাজগুলোকে তো ঢোকাতে হবে, নইলে জলের মত অর্থের চলাচলও তো বন্ধ হয়ে যাবে। তা হলে দাও খুলে 'লক-গেট'। ব্যস্, এবার বোঝ ঠেলা। গেট যেই খোলা হল, অমনি হুড় হুড় করে জল ঢুকে গেল লকে লেকে। তখন সমুদ্রের বা নদীর জলের লেভেল যা, লকের ও লেকের লেভেলও তাই হয়ে গেল। আগে যা ছিল, নিশ্চয় তার থেকে আলাদা। এবার জাহাজগুলো বার

করে দিয়ে নতুন জাহাজের সেট ঢোকালেন। গেট বন্ধ করে দিলেন। আবার যখন এই জাহাজগুলো বাইরে পাঠিয়ে নতুন সেটের জাহাজগুলো ঢোকালেন, তখন আবার তো লেভেল বদলে গেল লেকের। তাহলে তো একই অবস্থা। নদীর ধারে বা সমুদ্রের পারে জেটিতে জাহাজ ভিড়লে এমন কী ক্ষতি হতো এর চাইতে। না, এভাবে বন্দর হয় না। বন্দরের লেকে জলের লেভেল কতটা রাখা হবে, আগেই সন্নিহিত নদী বা সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা স্থির করতে হয়, সে ভাবেই নির্মাণ করতে হয় বার্থগুলো, বসাতে হয় ক্রেন, মেকানাইজ্‌ড কম্‌প্লেক্সগুলোর পরিকল্পনা সেভাবেই করতে হয়। লেকের বা ডকের জল এরকম ওঠানামা করা চলবে না, তাহলে কাজের ক্ষতি হবে, এমন কি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং জাহাজ ঢুকুক বা বার হোক, কোন অবস্থাতেই আমরা ডকের জলের লেভেল পরিবর্তন করতে দেবো না নদীকে বা সমুদ্রকে। প্রকৃতি তার খামখেয়ালীপনা নিয়ে থাকুক। আমরা আমাদের কাজ করতে চাই। তাহলে ঐ লকের বা খালের মধ্যে বসান আর একটা 'লক-গেট'। এবার সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়ে গেল।

ঐ লক বা খালের এ-প্রান্তে একটি লকগেট, ও-প্রান্তে একটি লকগেট। অর্থাৎ সমুদ্রের বা নদীর দিকে একটি আর লেক বা ডকের দিকে আর একটি গেট বসিয়ে জল আটকিয়ে দিলেন। একধারে সমুদ্র বা নদী, তারপর লকগেট একটি, লকের অন্যদিকে আর একটি গেট তারপর লেক বা আসল ডক আরম্ভ হয়ে গেল। এই যে 'লক', অর্থাৎ দুটি গেট-সেটের মধ্যবর্তী স্থান, তার দৈর্ঘ্য স্থির করতে হবে কত বড় জাহাজ এই বন্দরে ঢোকাতে চান, সেকথা ভেবে, বা পৃথিবীতে কত বড় দৈর্ঘ্যের জাহাজ তৈরী হয় তার খোঁজখবর নিয়ে।

এবার জাহাজ সমুদ্র বা নদী থেকে বন্দরে ঢোকাতে চান তো? খুলে দিন সমুদ্রের বা নদীর ধারের গেটটি, হুড়্‌হুড়্‌ করে সমুদ্রের বা নদীর জল ঢুকে গেল 'লকে'। সমুদ্রের বা নদীর জলের যে লেভেল, লকের জলের সেই লেভেল হয়ে গেল। জলের একই লেভেল তো দু জায়গায়ই, নির্বিঘ্নে জাহাজ ঢুকে গেল 'লকে'। কিন্তু আর একটি গেট যা ডকের প্রান্তে লকের মধ্যে আছে, সেটি তো এখনও বন্ধ। সুতরাং লেকে এবং ডকে অর্থাৎ যেখানে জাহাজগুলো ভিড়ে আছে, মাল খালাস করা বা মাল ভরার জন্যে, সেখানে জলের লেভেল যা ছিল তাই আছে। হেরফের হয়নি কিন্তু। বিঘ্নিত হয়নি

কোন কাজ। এইবার সমুদ্র বা নদীর ধারের লক-গেটটি বন্ধ করে দিন। লকের বা খালের দুদিকই বন্ধ। জাহাজ বা জাহাজগুলো আটকা পড়ে আছে এই লকে। লকে জলের লেভেল, সমুদ্র বা নদীর লেভেলের সমান কিন্তু ডকে আপনার চাহিদা অনুসারে যে লেভেল দরকার তাই। এবার জাহাজগুলো ঢোকাতে চাইছেন ডকে, যার জলের লেভেল লকের জলের লেভেল থেকে পৃথক। 'লক' তো একটা নাতিদীর্ঘ খাল ছাড়া আর কিছু নয়, যার দুপার আর তলদেশ সিমেন্টে কংক্রীটে বাঁধানো। ধারগুলোতে মাঝে মাঝেই নারকোল দড়ির ছোব্‌ড়া বা রাবার টায়ার কিট করা, যাতে ঢুকবার বা বেরোবার সময়ে জাহাজের ধাক্কায় পাড়ের বা জাহাজের নিজের ক্ষতি না হয়, তার জন্য। বিশাল লেক বা ডকের প্রেক্ষাপটে লকে কতটুকু জল আছে। গেটটা যদি খুলে দেওয়া যেতো, লকের জল যদি ছড়িয়ে যেতো লেকে, বা লেকের বেশী জলের লেভেল লকে ঢুকতো, ডকের ভিতরের জলের লেভেলের ব্যবধান কিন্তু এমন কিছু একটা বেশী হতো না, যাতে জাহাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো বা কাজের ক্ষতি হতো। কিন্তু ক্ষতি হতো যে জাহাজ-গুলো লকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের। হুড়মুড় করে জল ঢুকতো লকে বা লক থেকে বেরিয়ে যেতো। সেই সময়টাতে ঐ জাহাজগুলো চালানোই যেতো না। জলের আঘাতে জাহাজের কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা তো থেকে যায়ই। তাছাড়া লেভেলের ব্যবধান বেশী থাকলে জলের চাপ লক-গেটের ওপর এতো বেশী পড়ে যে ঐ অবস্থায় গেট খোলাও মুস্কিল। অন্ততঃ বেশী অশ্বশক্তিসম্পন্ন মোটর ব্যবহার করতে হয় এর জন্য। তার মানেই, গেট খোলার জন্য শ্যাফ্‌ট পিনিয়ন গিয়ার, গিয়ার বক্স, র‍্যাক সব ভালো ষ্টিল দিয়ে তৈরী করে মজবুত করতে হতো। তার জন্য খরচ পড়তো অনেক। সুতরাং লেক ও লেকের জলের লেভেলের তারতম্য থাকলে এক আধ ইঞ্চি তফাৎ থাকতে পারে, তার জন্য কিছু এসে যায় না।

লকের দুদিকের গেটই বন্ধ। নদীর বা সমুদ্রের লেভেল নিয়ে এখন আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। দরকার লক ও লেকের অর্থাৎ ডকের লেভেল নিয়ে। ধরুন দুটি লেভেলে ১০ফুট তফাৎ। তার জন্য বিশেষ কিছু পরোয়া নেই। লকের ধারে অনেকগুলো বেশী অশ্বশক্তি (Horse Power) যুক্ত পাম্প বসানো আছে। লেভেল ১০ ফুট তফাৎ হলেও লক তো বেশী লম্বা চওড়া নয়। আধঘণ্টা পাম্প চালিয়ে এই দশ ফুট জলের

তফাৎ সরিয়ে এক করে দিন। যদি লকের জলের উচ্চতা বেশী থাকে, তবে পাম্প করে জল বার করে দিন। যদি লকের জলের উচ্চতা ডকের চেয়ে কম থাকে, পাম্প চালিয়েই লকের জলের উচ্চতা বাড়িয়ে দিন। সমুদ্রের বা নদীর দিকের গেটটি বন্ধ রেখে ডকের দিকের গেট এবার খুলে দিন। জলের লেভেল লকে ও লেকে এক, সুতরাং জাহাজগুলো এবার নিরাপদে ডকে ঢুকে গেল। এদিকের গেটটি এবার বন্ধ করে দিতে পারেন, আবার খোলাও রাখতে পারেন ; তাতে কিছু আসে যায় না। জাহাজ বার করবার সময়েও এই প্রক্রিয়াতেই চালাতে হবে। অর্থাৎ ডকের কাছের গেটটি খুলে দিয়ে যে জাহাজটি বা জাহাজগুলোর বাইরে যাবার কথা, তাদের লকের ভিতর প্রবেশ করতে দিতে হবে ; অবশ্যই নদীর বা সমুদ্রের কাছের গেটটি তখন বন্ধ থাকবে। তবু চেক করা ভাল। ডকের কাছের গেট খুলে দেবার আগে, ডকের ও লকের জলের লেভেলের যদি তফাৎ থাকে, লক থেকে জল পাম্প করে বার করে বা লকে জল ঢুকিয়ে লেভেলের সমতা আনতে হবে। জাহাজ লকে ঢুকে গেলে, ডকের দিকের গেট বন্ধ করে দিন। সমুদ্র বা নদীর জলের লেভেল-ডাউন অনুযায়ী লকের জল পাম্প করে বার করে দিয়ে বা ভিতরে লকের জল ঢুকিয়ে জলের লেভেলে সমতা আনুন। এইবার সমুদ্রের বা নদীর দিকের লক-গেট খুলে দিন। তাহলে অনায়াসে জাহাজগুলো ধীরে ধীরে লক ছেড়ে দরিয়ায় গিয়ে ভাসবে, রওনা হবে তাদের গন্তব্যের দিকে। কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হল না।

এই লকের মধ্যেই আর এক সেট 'লক-গেট' বসাতে হয়। কারণ, দৈব দুর্ঘটনার কথা তো বলা যায় না। যদি দুটি গেট থাকে, এবং তার একটি কোনো কারণে অচল হয়, তবে ডকই বন্ধ, জাহাজ চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে ডক ও লক। তিনটি গেট থাকলে যে কোন দুটি গেটের সাহায্যে ডকের এই কাজ চলে যাবে অনায়াসে। তাছাড়া যে কোন জিনিসের মতই এই গেট মেরামতি করতে হবে, বোল্ট নাট চেক করতে হবে, ওয়াটার সিলিং রবার বা কাঠ পাল্টাতে হবে, রং করতে হবে। বাৎসরিক এই সব ব্যাপারগুলো তো আছেই। সুতরাং তিনটি 'লকগেট' সেট একটি ডকে ভীষণ প্রয়োজন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা মনে হয় আপনাদের সরগর হয়ে গেছে। প্রথমে নদী বা সমুদ্র, তারপর লক, তাতে তিনটি গেট, তারপর লেক বা ডক। ডকে ভিন্ন ভিন্ন ঘাট বা বার্থ, যেখানে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে জাহাজ ভিড়বে। বার্থগুলো

জাহাজের নিরাপত্তার জন্য এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বেশ দূরে দূরে করতে হবে। এই বার্থগুলোর কোনোটিতে মাল উঠবে জাহাজে, কোনটিতে মাল নামবে। বিশেষ মাল ওঠাবার জন্য বিশেষ বার্থ ; বিশেষ মাল নামাবার জন্য বিশেষ বার্থ। এই মাল নামানো-ওঠানোর জন্য বিভিন্ন রকম ক্রেন বসানো আছে। কোন কোন জায়গায় আছে বিশেষভাবে তৈরী প্রায় স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা, কোন বিশেষ মাল জাহাজে বোঝাই'করার জন্য ; কোন জায়গায় প্রায় স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে কোন বিশেষ মাল নামিয়ে আনার জন্য। সম্পূর্ণ এই ব্যবস্থা মিলে হলো একটি বন্দর। হলদিয়ায় এমনি একটি আধুনিক বন্দর গড়ে উঠেছে যার সম্প্রসারণের আশা আছে বিস্তর। এটি গড়ে উঠেছে কলকাতা বন্দরের সাহায্যকারী বন্দর হিসাবে ; সেজন্য এই দুটি বন্দরকে মিলে বলা হয় 'ক্যালদিয়া' বন্দর।

হলদিয়া সম্বন্ধে কিছু বলার আগে, কলকাতা বন্দরের পটভূমি, ইতিহাস ভূগোল, তার অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। তাহলে বোঝা যাবে হলদিয়া কোন বিষয়ে কলকাতার পরিপূরক বন্দর, কি কি ব্যাপারে হলদিয়া আধুনিক এবং হলদিয়ারও কতখানি সম্ভাবনা এবং কেন কলকাতা-হলদিয়া মিলে একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় একটি বন্দর হিসাবেই থাকা উচিত।

এখনও কলকাতা পূর্ব-ভারতের প্রধান বন্দর ; একদিন ভারতবর্ষের প্রধান বন্দর ছিল। কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে। এর বিস্তৃতি আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, অরুণাচল, পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও আংশিকভাবে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ এবং দুটি বিদেশী রাষ্ট্র নেপাল ও ভূটান পর্যন্ত। ভারতের দশটি প্রধান বন্দরের মধ্যে একমাত্র কলকাতাই নদী-নির্ভরভাবে গড়ে উঠেছে হুগলী বা ভাগীরথী নদীর বাম তীরে সমুদ্র থেকে ১২৬ জল-মাইল (nautical miles) দূরে। এই বন্দরের দুটি ডক ; একটির নাম খিদিরপুর ডক আর একটির নাম ছিল কিং জর্জেস ডক। সংক্ষেপে বলা হতো কে পি-ডক এবং কে জি-ডক। কিং জর্জেস ডকের নাম অধুনা হয়েছে নেতাজী সুভাষ ডক।

দুমুখী পণ্য পরিবহনের দাবীতে বন্দর ব্যবস্থার মধ্যে আছে প্রায় ৮০টি জাহাজকে একসঙ্গে রাখার ব্যবস্থা ও ৫০টি জাহাজকে কাজের জায়গা দেবার মতো নদীতীরের জেটি, অবরুদ্ধ ডক ও নোঙ্গর-ঘাটা। বেশীর ভাগ জাহাজের পথ

পরিক্রমার শেষ বন্দর হওয়ার ফলে, জাহাজ সারানোর প্রয়োজনে এখানে আছে ৫টি শুখা ডক (dry dock)। এ বন্দরের পশ্চাদভূমি শুধু যে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ সম্পদে সমৃদ্ধ তাই নয়, এখানকার সড়ক, রেল ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। এই সব কারণেই কলকাতা একদিন ভারতের প্রধান শহর ও বন্দর হতে পেরেছিল।

বন্দর ইতিহাসের প্রথম পর্বের কাজ ছিল মন্থরগতি পালতোলা জাহাজে বোঝাই-খালাসের কাজ। কাজ হতো নোঙ্গর-ঘাটায় ছোট ছোট নৌকোর সাহায্যে। বন্দর হিসেবে কলকাতা বন্দরের উন্নয়নের প্রথম ধাপ হলো ১৮৬০ সালে নদীর ধারে ৪টি 'জু-পাইল' জেটি নির্মাণ দিয়ে। পরে এর সাথে যোগ করা হলো আরো ৪টি জেটি। বন্দরের কর্তৃত্ব একটি কমিশনের ওপর অর্পণ করা হল ১৮৭০ সালের ১৭ই অক্টোবর। এই সময়ে কলকাতা বন্দরের কাজের পরিমাণ ও বিভিন্নতা দ্রুত বাড়তে লাগল, কারণ তখন চলছিল ইংল্যাণ্ড ও সারা ইউরোপময় শিল্পবিপ্লব আর ভারতবর্ষের শাসক ছিল ইংরেজরা। লন্দরকে বন্দররূপে সুসজ্জিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ফলে ১৮৮৬ সালে বজবজে তেলের জেটিগুলো নির্মিত হলো। ডায়মণ্ডহারবারে মুক্ত নদীতেই পোতাশ্রয় নির্মিত হলো।১৮৯৩ সালে নির্মিত হলোখিদিরপুর ডক। বন্দর উন্নয়নের পক্ষে এগুলি এক একটি সোপান। এর মধ্যে পণ্যের পরিমাণও বেড়ে দাঁড়াল শুরুর সময়ের প্রায় দ্বিগুণ।

পরের পর্যায়ে উন্নয়ন এল আরো দ্রুতলয়ে। ১৯২৩ সালে খিদিরপুর ডকের অদূরে আরো একটি ডক নির্মাণ হলো, আরো আধুনিক করে গড়া হলো এটিকে, নির্মাণ কার্য শেষ হলো ১৯২৮ সালে। নাম হলো কিং জর্জেস ডক, এখন যার নাম নেতাজী সুভাষ ডক। ১৯২৫ সালে গার্ডেনরীচে নদীর ধারে ৫টি জেটিও তৈরী করা হলো। ইতিমধ্যে দেশে, বিশেষভাবে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে উন্নতমানের কারিগরী জ্ঞানের বিকাশ হলো ; খনিজ ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি, রাসায়নিক, বাস্তকরণ, পরিবহন, গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসারের ফল দ্রুত ঘটতে লাগল। পশ্চাদভূমির অর্থনীতি ও বাণিজ্যের এই বহুমুখী উন্নতি বন্দরের নানাবিধ ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি ঘটাতে লাগল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরের কিছু সময় দেশের নানাবিধ উন্নতি ও পরিবর্তন বন্দর-ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট চাপ দিতে লাগল। ফলে সাময়িকভাবে যে সমস্ত-ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ সূচি গ্রহণ করা হলো,

সেগুলি হয়ে পড়লো এলোমেলো; যথাযথ পরিকল্পনা-প্রসূত হয়ে উঠতে পারল না।

এই বন্দরের উন্নতির সর্বশেষ সোপানটি শুরু হলো দেশের জাতীয় পরিকল্পনা ও তার উন্নয়নের সঙ্গে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হলদিয়ায় গভীর জলের ডক-প্রকল্প-সহ ৩৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই বন্দরের জন্য। তাই দিয়ে কেনা হয়েছে নানা ধরনের জলযান, তৈরী হয়েছে নতুন গুদাম ও বার্থ, নির্মাণ হয়েছে রেলওয়াগন ইত্যাদি রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডের সম্প্রসারণও করা হয়েছে। এছাড়া ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করা হলো, পুরনো একটি পুলের পুনর্নির্মাণ করা হলো, পণ্যবহনের আধুনিক যন্ত্রপাতিও কিছু কেনা হলো। কারখানা ও জাহাজ সারাই-এর ব্যবস্থাদিরও উন্নতি করা হলো। শুখা-ডকগুলির আধুনিকীকরণ করা ও নদীর নাব্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনে ড্রেজিং করা হলো, নেভিগেশন-চ্যানেল এবং নদী-প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো স্বাধীন দেশের স্বাধীন যুবকদের। এতো করেও কিন্তু বিশেষ কিছু হলো না। আগে যে কলকাতা বন্দর সারা দেশের ৫০ শতাংশ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতো, এখন সেই বন্দরে রপ্তানীর মারফৎ ২৫ শতাংশ এবং আমদানী মারফৎ ১২ শতাংশ মুদ্রা অর্জিত হতে লাগল।

যুদ্ধপূর্ব (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) কলকাতা বন্দর যেখানে ৫০ লক্ষ টন ওজনের পণ্য আমদানী-রপ্তানী করে বিশ্বের একটি প্রধান বন্দর হিসেবে নাম কিনেছিল যুদ্ধের সময়ে ও তারপর স্বাধীনতার পরে সে কেমন বাণিজ্য করল আর এখনই বা কেমন বাণিজ্য করছে দেখা যাক। এগুলি পর্যালোচনা করলেই হলদিয়া বন্দরের আবির্ভাবের মূল খবর পাওয়া যাবে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক বিকলাঙ্গতা আনলেও, কলকাতা বন্দর কিন্তু ভারতবর্ষে ১৯৫৪-৫৫ সাল অবধি তার শীর্ষস্থান বজায় রাখতে পেরেছিল। ১৯২৮-২৯ সালে এই বন্দরে মোট জাহাজ-বাহিত পণ্যের পরিমাণ ছিল ১১০ লক্ষ টন; ১৯২৯-৩০ এও তা-ই ছিল। আবার ছিল ১৯৪৫-৪৬এ এবং সর্বশেষ ১৯৬৪-৬৫-এ। তারপর পণ্যের ভিড় হঠাৎ কমে গেল। তার অনেক কারণ আছে। একটি কারণ এখানে বলে বাকীগুলি পরে আলোচনা করছি। সেটি হলো এই: বন্দরে মাল আমদানী-রপ্তানী প্রচুর কমলেও প্রায় একই শ্রমিকসংখ্যা নিয়ে খরচ একই রইলো অথচ নানারূপ শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘটের ফলে দৈনিক

উৎপাদন-ক্ষমতা, ও দক্ষতা কমে গেল। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে কলকাতা বন্দর মাল-পরিবহনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে লাগল ও লোকসান দিতে লাগল। আনন্দ ও গর্বের বিষয়, সাম্বিক প্রশাসনিক উন্নতির ফলে, বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, ১২ বছর পর ১৯৭৮-৭৯ সালে কলকাতা বন্দরে আবার দেখা দিয়েছে বাণিজ্যপ্রগতি। ১৯৭৭-৭৮ সালের চাইতে ৫.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে মাল বোঝাই-খালাসের পরিমাণ। এই বছরে এই বন্দরে সামগ্রিক পণ্যের পরিমাণ হলো ৮২·৩৮ লক্ষ টন। আবার ১৯৭৯-৮০তে ৬% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭ লক্ষ টন গত দশ বছরের মধ্যে এটি রেকর্ড। কিন্তু বহু পূর্বেই কয়েকটি বছরে যে রেকর্ড হয়ে আছে অর্থাৎ ১১০ লক্ষ টন, সেই লক্ষ্যে এ বন্দর আবার কবে পৌছোবে কে জানে! অবশ্য একদিনের বোঝাই-খালাসের পরিমাণেরও রেকর্ড হয়েছে ইতিমধ্যে ১৬,১৫৫ টন। ১১০ লক্ষ টনের রেকর্ডকে যদি ছাড়িয়ে যেতে হয় কলকাতা বন্দরের আর একটি ডক চাই, ঢেলে সাজানো চাই অনেক কিছু। পুরনো বন্দরের পুনর্বিন্যাস চাই; নতুন ভাবে সাজানো চাই নতুন বন্দর। সে বন্দরটি নানা কারণেই, কে পি ডকের পাশে কে জি ডক যেমন, তেমনটি হতে পারে না। তাকে গড়ে উঠতে হবে নতুন পরিবেশে, নতুন শক্তিতে, তবে পুরনো অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ ও সহায়তা নিয়ে।

এইবার, কলকাতা বন্দরে কেন পণ্য হ্রাস পেল, তা বৃদ্ধি করবার জন্য কী কী করতে হলো, খতিয়ে দেখা যাক। তাহলেই কী করে হলদিয়া হলো, সে ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাবে।

কলকাতা বন্দরের একটা বিশাল পশ্চাদভূমি ছিল। স্বাধীনতার সাথে সাথেই তার একটা অংশ, কৃষিসমৃদ্ধ পূর্ব-বাংলা বিদেশ হয়ে গেল। গঙ্গার মূল স্রোত ঐ নতুন দেশের মধ্য দিয়েই গিয়েছে। আগে গঙ্গা বা পদ্মা থেকে ভাগীরথী দিয়ে জল নেমে আসতো, পুষ্ট করতো বন্দরকে, তার খামখেয়ালীপনাও আরম্ভ হয়ে গেল এই সময়। বন্দরের সহায় হওয়ার বদলে, তাকে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন করেছে সে। গঙ্গানদীর জলের বেশীর ভাগই পদ্মা নদী দিয়ে বয়ে যাওয়াতে, গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথী, জলঙ্গী ও চূর্ণী জলোচ্ছ্বাসধৌত ছোট ছোট খাল ছাড়া আর কিছুই নয় এখন। এতে জল থাকে বছরে মাত্র ৪ মাস, বর্ষার নতুন জল গঙ্গার জলমাত্রাকে বাড়িয়ে তোলার ফলে, কিছুটা জল উপচে এই খালগুলিতে এসে পড়ে। এরই ফলে,

ভাগীরথীর ধারাবাহী হুগলী, বছরের মধ্যে ৮ মাসই হয়ে পড়ে কেবলমাত্র সমুদ্র-জোয়ারের জলবাহী এক খাঁড়ি মাত্র। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী-বিজ্ঞানী ভগীরথের পরে তো আর কেউ এই গঙ্গানদীকে সংস্কার করেনি। তাহলে কীভাবে আর বলবো গঙ্গার বা ভাগীরথীর খামখেয়ালীপনা। প্রত্যেক জিনিসের মতো নদীরও তো পরিচর্যা চাই। সুতরাং ব্যাপারটা হতে থাকল এই: ক্রমাগত ক্ষীয়মান ভাঁটার টান এবং ক্রমবর্ধমান জোয়ারের জল হুগলীর পলিকে বাড়িয়েই চলল। ফলে, সব রকম জাহাজ আসা-যাওয়ার ব্যাপারেই হুগলী হয়ে পড়লো বিশেষ সমস্যাসংকুল এক জলপথ। আর যে একটা কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না; তা হলো, এই কারণেই গঙ্গার জল হয়ে পড়ল লবণাক্ত, যা দিয়ে পানীয় জল হয়তো তৈরী করা চলে। কলকারখানার জন্য ব্যবহৃত জল কে আর অত পরিশ্রুত করবে? সুতরাং বহু ব্যবহারে ঐ লবণাক্ত জল কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির ক্ষতি করতে পারে। অনতিদূরে না হলেও সুদূরে এই বিপদ কিন্তু ওৎ পেতে আছে। সুতরাং কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য হাতে নেওয়া হলো ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা, যা শেষ হলো ১৯৭৫ সালে। মূল গঙ্গার জল ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে উদ্বোধন হলো এক নয়া জয়যাত্রার; নিজেদের ভগীরথের বংশধর মনে করতে পারলাম। সঞ্জীবিত হলো কলকাতা বন্দর, প্রাণের অঙ্কুর ফুটে উঠল হলদিয়ায়। ইঞ্জিনীয়াররা ফরাক্কা প্রকল্পের এমন ডিজাইন করেছেন যাতে ৪০,০০০ কিউসেক পলিহীন জল হুগলী নদীতে পাঠানো যেতে পারে, এমন কি গ্রীষ্মের সময়েও। গ্রীষ্মে এই জলের চেয়ে বেশী জল থাকে গঙ্গার বুকে ফরাক্কার উজানে। সুতরাং বাকী জলটুকু যা বাংলা দেশ পাবে, তাদের পক্ষে তাই-ই কিন্তু যথেষ্ট। তবু কেন আমরা ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি করলাম যার জন্য হুগলী নদীতে গ্রীষ্মকালে আসছে মাত্র ১২,০০০/১৫,০০০ কিউসেক জল অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১২/১৫ হাজার কিউবিক ফুট জল! এতে কলকাতা বন্দর বাঁচবে না; হলদিয়ারও নাভিশ্বাস আরম্ভ হলো বলে। এর ফলে কলকাতার বালী ব্রিজের কাছে প্রতি বছর চৈত্রমাসে চড়া পড়ে। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো এই, এই 'নিজের মরণ নিজে ডেকে আনা' চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে অল্প কিছুদিনের মধ্যে। আশা করা যেতে পারে ভারত সরকার আর ভুল করবেন না, অচিরেই কলকাতা বন্দর অন্তত ১১০ লক্ষ টন মালবহন করে তার হৃত গৌরব উদ্ধার করবে এবং হলদিয়া এগিয়ে যাবে দ্রুত পায়ে আরো আধুনিকতার দিকে।

কলকাতা বন্দরের সমস্যা কিন্তু শুধু এই নাব্যতা নিয়েই নয়। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের আধুনিকীকরণের ফলে সারা পৃথিবীতেই আজকের জাহাজ প্রস্থে, গভীরতায় ও দৈর্ঘ্যে অনেক অনেক বড়। তারও চেয়ে বড় অয়েল ট্যাঙ্কারগুলো। এদের সাথে পাল্লা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মাল খালাস-বোঝাই করার তাগিদ এল এবং জন্ম হলো তড়িৎগতিসম্পন্ন যন্ত্রাদির। শুধু তাই নয়, মালগুলি সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনারও উদ্যোগ নেওয়া হলো। এইভাবে উদ্ভব হল 'কনটেনার' এর এবং 'কনটেনার ক্রেনের'। পরে এ ব্যাপারে বিশদভাবে লিখছি। এই বড় জাহাজগুলি চালানো ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার খরচ স্বভাবতই বেশী পড়ে। তাই তাড়াতাড়ি বোঝাই-খালাস করতে পারলে পরিবহন খরচ অনেক কমে যায়। জাহাজ পরিবহনের এই গতিপ্রকৃতির শুরু ১৯৫৫ সালের পর থেকে। কিন্তু পুরনো এই কলকাতা বন্দরে এতো বড় জাহাজ ঢোকানোর প্রধান সমস্যা নদীর নাব্যতা। তাছাড়া বন্দরের 'লক' অত চওড়া নয়, জলের গভীরতাও (Draft) কম। বন্দরে অনেক জাহাজ ঢোকানোর ক্ষমতা থাকলেও, মাল-নামানো ওঠানোর তড়িৎ-ব্যবস্থা নেই। ক্রেনগুলো পুরনো ধরনের এবং অত অধিক ক্ষমতাসম্পন্নও নয়। তাই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ২০০ টন ক্রেন নেতাজী সুভাষ ডকে বসানো হলো। কিন্তু মাল নামিয়ে রাখা, গুদামজাত করা এবং দেশের নানা জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে দেবার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনে। ১৯৪৭ সালে ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মাল-বহনের পরিমাণ ছিল যেখানে ১·১ কোটি টন, আজকে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬·৫ কোটি টনে। অর্থাৎ তিনগুণেরও বেশী। এর কারণ, ভারী পণ্যের (Bulk cargo) বাণিজ্য বৃদ্ধি। এই ধরনের পণ্যের মধ্যে দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আকরিক লোহা, কয়লা, রাসায়নিক সার, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। কলকাতার অংশ এই বাণিজ্যে নামমাত্র। কলকাতা এতদিন পাঠিয়েছে পূর্ববঙ্গের পাট, সে তো এখন বিদেশী সোনালী আঁশ; এছাড়া পাঠিয়েছে উত্তরবঙ্গের ও আসামের চায়ের পেটি, বিহারের তামাক ও শস্য, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার নানা কাঁচা মাল আর পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি।

এখন ভারত স্বাধীন হয়েছে। তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হচ্ছে। তার জন্য ভারী ও বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হচ্ছে। রপ্তানীযোগ্য অনেক ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য এখন দেশে তৈরী হচ্ছে। সেগুলো পাঠানো হচ্ছে বিদেশে। আর এই যে কর্মযজ্ঞ তার জন্য বিশেষ করে দরকার বিদেশী

মুদ্রা। তাই আমরা বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বিদেশী বাজারে বিক্রী করে দিয়ে সেই 'স্বর্ণমুদ্রা' সংগ্রহ করছি। সেজন্য আমাদের রপ্তানী করতে হচ্ছে আকরিক লোহা (Iron ore), কয়লা, রাসায়নিক সার ইত্যাদি, আমদানী করতে হচ্ছে তেল ও পেট্রোল। আর এ সমস্ত তো উড়ো জাহাজে পাঠানো যায় না। বিদেশের সাথে রেল যোগাযোগও তেমন নেই। আর জাহাজ পরিবহন যে সব চাইতে সস্তার পরিবহন, তা কে না জানে। তাছাড়া, একসাথে অনেক মালও পৌঁছে দেওয়া যায় অন্য ঘাটে।

আরো একটা ব্যাপার আছে। স্বাধীনতার পরে অন্যান্য প্রদেশও দাবী তুলছিল এবং চাপ দিচ্ছিল যে তাদের প্রদেশেও যেন বন্দর তৈরী করা হয়, দাবী খুব অযৌক্তিক নয়। তাই তৈরী হয়েছে অন্ধ্রে ভিজাগাপট্টম বন্দর উড়িষ্যায় পারাদীপ। সমুদ্রের উপর বন্দর দুটি হালে তৈরী, সুতরাং আধুনিক। রাজ-নৈতিক কলকাঠি যে এর পেছনে নেই তাও নয়। সুতরাং কলকাতা পড়ে যাচ্ছিল মহা ফাঁপরে। এই বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে, তাকে আধুনিক কায়দায় সম্প্রসারিত হতে হবে। কলকাতা যে ধীরে ধীরে আধুনিক হয়ে উঠছিল না, তাও নয়। যেমন নেতাজী সুভাষ ডকে ২০০ টন ক্ষমতার ক্রেন বসানো হলো। এটলাস, মহাবাহু, বীরবাহু, তিনটি ফ্লোটিং ক্রেন দিয়ে মাল চলাচল করার ব্যবস্থা হলো, সম্প্রতি 'কনটেনার'ও হ্যাণ্ডেল করা হচ্ছে। তবে এ সমস্তই হচ্ছে বিগতযৌবনার প্রসাধন প্রলেপের মতো। কলকাতার দরকার দস্তরমতো একটি পরিপূর্ণ যুবতীর মতো ডক, যা অন্যান্য বন্দরের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে। হলদিয়াতেই সে সমস্যার সমাধান।

এইবার হলদিয়ায় ফিরে আসা যাক আবার। অয়েলজেটির কথা তো আগেই বলেছি। 'লক' কি ব্যাপার তার কথাও কিছু বলা হয়েছে। এবার হলদিয়া বন্দরের কথায় একটু বিশদভাবে যাবো। হলদিয়া বন্দরে বা হলদিয়ার কাছে নদীতে জাহাজ চলাচলের যে খাত তার গভীরতা ছিল—৩৩ ফুট। ফরাক্কার জল ছাড়ার পর এবং তীব্রভাবে ড্রেজিং চালিয়ে যাবারাপর এর গভীরতা হয়েছে ৪২ ফুট। ফরাক্কার ৪০,০০০ কিউসেক জল যদি পাওয়া যায় এবং এমনি ভাবে যদি ড্রেজিং চালিয়ে যাওয়া যায় জলের গভীরতা ৪৫ ফুট তো দাঁড়াবেই, আরো ২/৩ ফুট বাড়ানোও যেতে পারে। ৪২ ফুট গভীরতায় আমরা এখনই ৮০,০০০ টনের (নিজস্ব ওজন) বিশাল জাহাজকে এই বন্দরে ভিড়তে আমন্ত্রণ জানাতে পারি। গভীরতা ৪৫ ফুট বা তার বেশী হলে ১,০০,০০০

টনের জাহাজকে অনায়াসে ডাকবো। পৃথিবীতে এর চাইতে আর বিশেষ বড় জাহাজ হয় না, অয়েল ট্যাঙ্কার ছাড়া। 'লক'কে চওড়া করা হয়েছে ৩০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে করা হয়েছে ৬২ ফুট। এর অর্থ একটি ১২০/১২৫ ফুট চওড়া ৮৮৫ ফুট লম্বা জাহাজকে আমরা লকে তথা ডকে ঢুকিয়ে নিতে পারি। এর বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকার জন্য (অবশ্যই জাহাজের) লকে প্রবেশদ্বারের ব্যবস্থা হয়েছে। তাকে বলা হয় লক-এনট্রান্স-লিড-ইন জেটি। এর দৈর্ঘ্যও কম নয়, ১০১০ ফুট। লকে ঢুকতে গেলে কিছু সাজ পোশাক করতে হবে জাহাজকে। লকের এপাশে ওপাশে ধাক্কা মেরে যাতে ভেঙে না দেয় তার জন্য জাহাজের দুপাশে লাগাতে হবে রাবার প্যাড, আধুনিক 'কুশন'। নদীর পাইলট সাহায্য নেবে ডকের পাইলটের। ওঠা-নামা করতে হবে নাবিককে। পারে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেবেন অনেক নাবিক, জাহাজের ভেতরেও নাবিক থাকবেন সে নির্দেশ মেনে পরিপাটিভাবে কাজ করে যাবার জন্য।

এই লকে জলের লেভেল নামিয়ে উঠিয়ে জাহাজ ঢোকান হয়, আগেই বলেছি। তার জন্য 'লক-গেট' বসাতে হয়,এবং তিনটি লক-গেটের প্রয়োজন, তাও বলেছি। এখন দেখা যাক এই লক-গেটগুলি কেমন হয়। সাধারণত আগের ডকগুলিতে এই লকগেটগুলি হতো, 'মাইটার লক গেট' অর্থাৎ দুপাল্লা কপাটের মতো। পাড়ের দিকে 'হিঞ্জ' অর্থাৎ কব্জা থাকতো; অর্ধ বৃত্তাকারে গেটগুলি খোলা-বন্ধ হতো। যখন বন্ধ হতো, তখন একটা কোণ সৃষ্টি করে গেটগুলি মুখোমুখি লেগে থাকতো। আর দুটো পাল্লারই মুখে লাগানো থাকতো কাঠ। স্থাপন করবার পর কিছু দিন এই কাঠের জোড়ের মুখ দিয়ে জল অল্প লিক করতো বটে, তবে কিছুদিন চলার পর, নিজেদের মধ্যে ঘষাঘষি করে জোড়ের মুখ মসৃণ হয়ে যেতো এবং জল আর লিক করতো না। এ ব্যবস্থা যে খুব খারাপ তা নয়। লকের চওড়া কম হলে, খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু এতে লকের পাড়ে পাল্লাগুলো সেঁটে থাকতো (খোলার সময়) লকের আসল চওড়া এই পাল্লাদুটির জন্যই কমে যেত। সেটা খুব কাজের কথা নয়। সেজন্য অন্যরকম একটি গেটের উদ্ভাবন হলো। যদিও প্রাথমিক ব্যয় এর জন্য বেশী, বন্দরের আয়ুকাল ধরলে এবং বেশী চওড়া জাহাজ বন্দরে ঢোকানোর জন্য লাভ খতিয়ে দেখলে এ ব্যয় কিছুই নয়। এই গেটের নাম 'কাইসন-গেট' বা ক্যাজু-গেট (Caisson-Gates)। ফরাসী দেশে এই গেটের উদ্ভাবন হয়েছিল, সেজন্য নামটা এইরকম কলকাতা

বন্দরে মাইটার লক গেট ও কাইসন গেট—এই দুরকম গেটই আছে। কলকাতা বন্দরে যে কাইসন গেট আছে, তা অনেক ছোট ও প্রাচীন গোছের (Primitive type)। আদি কাইসন গেটের এবং কলকাতা বন্দরের লক অনেক কম চওড়া।

হলদিয়ায় কিন্তু এই লক গেট একেবারে আধুনিক; এই লক-গেট হলো 'কাইসন গেট'। এত বড় কাইসন গেট এশিয়াতে আর নেই, একমাত্র জাপান ছাড়া। পৃথিবীর মধ্যে এটি পঞ্চম বৃহৎ। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে এই লক-গেট, এর চলাচল-ব্যবস্থার সব সাজ-সরঞ্জাম এই ভারতেই তৈরী, একমাত্র হাইড্রোলিক মোটর ও সিস্টেম ছাড়া। সম্পূর্ণ ভারতীয় ডিজাইন। ব্রিটিশ ফার্ম আর, পি, টি, এর কনসালট্যান্ট ছিল—এইমাত্র। তিনটি কাইসন গেট বসান হয়েছে হলদিয়া ডকের লকে-এ। প্রথমটি বসেছে 'লক-এন্ট্রান্স থেকে ১০১০ ফুট দূরে। দ্বিতীয়টি বসেছে প্রথমটির থেকে ২৮২ ফুট দূরে এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়টির দূরত্ব ৬৮০ ফুট। এখন জাহাজের দৈর্ঘ্য বুঝে, প্রথমটি ও তৃতীয়টি কিংবা দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি চালু করে জাহাজ চলাচল করানো হবে ডকে-নদীতে, নদীতে-ডকে।

এগুলো স্লাইডিং টাইপ গেট; টেনে লকের মধ্যে আনা হয়, আবার টেনেই সরিয়ে দেওয়া হয় লক থেকে। স্বভাবতই লক থেকে সরিয়ে দিলে জাহাজগুলো লক দিয়ে ঢুকতে বেরুতে পারবে। লকে তো সব সময় জল ভর্তি, তার লেভেল যাই-ই থাকুক না কেন। সুতরাং কাইসন গেট সরাতে হলে, পাড়ের মধ্যেই একটি ক্যানাল কাটতে হয়েছে। লক থেকে জলের মধ্যে টেনে সেই ক্যানালে গেট ঢুকিয়ে রাখলে লক খুলে গেল। ব্যাপারটা ড্যাগিং এর ব্যাপার অর্থাৎ টানাটানির। এর জন্য যে মেশিনারী তা বসাবার জন্য তিনটি ঘর হয়েছে, তিনটি কাইসনের জন্য। এই ঘর তিনটি করতেই মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস বেরিয়ে যাবে। আর হবেই বা না কেন? এই কাইসন গেট তো কম নয়। সাইজ ও ওজন শুনে চমকে যাবার মতো। এক একটি কাইসন গেটের চওড়া ২৪ ফুট; উচ্চতা ৬১ ফুট ৭½ ইঞ্চি; দৈর্ঘ্য-১৯২ফুট ৬ ইঞ্চি। এর নিজস্ব ওজন ১১৮০ টনেরও বেশী। এক একটি গেটের মধ্যে জল ভরার জন্য (নদীর জল) ৬টি করে পেনস্টক গেট আছে। প্রায় ৯০টি বিশাল বিশাল ভাল্‌ভ ও পাইপ লাইন আছে, জল ভর্তি করবার এবং বার করে দেবার জন্য। এ হেন জিনিসকে টানা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

যে লোহার দড়ি দিয়ে টানা হচ্ছে তা হচ্ছে ২½ ইঞ্চি মোটা। এই টানাটানির ব্যাপারে মোটর মেশিনারীর উপর চাপ পড়ছে ৮০ টনের। এই মেশিনারীর মধ্যে দুটো মোটর লাগছে, এক একটি ২৫০ অশ্বশক্তির। এই মোটরগুলো মিনিটে ২৫০ বার ঘুরছে। কাইসন গেটের চলাচলে যাতে ঝাঁকি না লাগে সেজন্য এই ইলেকট্রিক মোটর দিয়ে হাইড্রোলিক মোটর চালিয়ে মেশিনারী গুলি চালান হয়, যাতে সমস্ত চলাচলের ব্যাপারটাই সহজ হয়। এই কাইসন গেটের গতিবেগও খুব কম নয়—মিনিটে ৫ ফুট থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত। প্রথমে বেগ কম থাকবে, তার পর বাড়বে। লকের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় পৌছাতে লাগবে মাত্র ৪ মিনিট সময়। দৈনিক এই কাইসন গেট চলাচল হবে গড়ে ২০ বার, অর্থাৎ লক খোলা-বন্ধ হবে— যার মানে ২০ বার জাহাজ হয় বন্দরে ঢুকবে নাহলে বন্দর থেকে বেরুবে। এই যে মেশিনারী-ঘর, তাতে আছে একটি করে ই, ও, টি ক্রেন। ঐ মেশিনারী গুলিকে সারাই করার জন্যে যে কোন সময় ওটির দরকার হতে পারে।

ঐ যে লক অর্থাৎ বন্দরে জাহাজ ঢুকবার পথ, তার চওড়া ১৩০ ফুট, আর এই কাইসন গেট-এর দৈর্ঘ্য ১৪১ ফুট ৬ ইঞ্চি, যা দিয়ে লকটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া গেল। এই ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি বেশী রাখা হয়েছে, অর্থাৎ লকের এক এক পাড়ে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি করে বেশী রাখা হয়েছে জলের লিক বন্ধ করতে। এজন্য ঢালাই লোহা ও রাবার দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। মেশিনারী দিয়ে টেনে কাইসন গেটটি যখন লকে এনে বসান হলো, গেটটি জলে সামান্য ভাসছে। এখন গেটের ভিতরের চেম্বারের ভাল্‌ভ খুলে, যা ওপরের থেকেই খোলা যায়, জলে ভর্তি করে দিলেই গেট লকে বসে যাবে। বসে গেলেই, ঢালাই লোহা, রবার আর স্টেইনলেস স্টিলের পথ নিজেরাই আটকে গিয়ে জলের চলাচলের পথ বন্ধ করে দেবে। সুতরাং একবার গেট বসাতে পারলে এধারের জল ওধারে কোনমতেই যেতে পারবে না। আপনার দরকার মতো 'পাম্প-ইন' অথবা 'পাম্প-আউট' করে নদীর লকের ও ডকের জলের লেভেল ঠিক করে নিতে পারবেন। জাহাজ চলাচলের আর কোন বাধাই থাকছে না।

এবার জাহাজ বন্দরে ঢুকে গেল। ডকের আকৃতি তো প্রায় গোলাকার, মস্ত সেই ডকের পাড়ে বিভিন্ন ঘাটে বা বার্থে জাহাজগুলি এসে ভিড়বে। হলদিয়াতে, প্রায় অন্য সব বন্দরের মতোই, লকের পরে আসল ডকটি একটি

বাঁক নিয়েছে, নিয়ে হলদিয়া শহরের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে গেছে। চওড়ায় হয়েছে বিশাল, লম্বায় হয়েছে বিশালতর। এই বাঁক নেওয়ার একটা মাপ আছে। বিশাল বিশাল জাহাজ ঢুকবে, বলে এই বাঁকের ব্যাসও (Diameter) বেশ বড়, ১৮০০ ফুট। আগেই বলা হয়েছে, এই ডকে সব সময়ে জলের গভীরতা থাকবে ৪৫ ফুটের মতো। এই বন্দরের লেকের মধ্যে জাহাজ ভিড়ে থাকতে পারবে এবং মাল খালাস-টালাসও করতে পারবে। বন্দরের মধ্যে কী কী ব্যবস্থাগুলো আছে তা বিশদ ভাবে বলার আগে উল্লেখ করা ভাল, বন্দর ও শহর পত্তনের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৪½ বর্গমাইল জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তা ছাড়া ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পেট্রোকেমিক্যাল-এর জন্য জায়গা আছে বিস্তর। ছোট, বড় ও মাঝারি শিল্পের জন্যও জায়গা আছে; এবং আরও জায়গা অধিগ্রহণের সুযোগও আছে। দরকার হলে হলদিয়া পেরিয়ে যাবে দুর্গাচক, মহিষাদল, কুঁকড়াহাটিতে, হলদি নদী পেরিয়ে সুদূর প্রান্তরের দিকে; যাবে আরো এগিয়ে গঙ্গানদীর মোহানার দিকে।

এবার দেখা যাক, এই হলদিয়া ডকের মধ্যে কী ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। এবং তা কতটাই বা আধুনিক।

প্রথমেই বলা যাক **আকরিক লোহার ঘাটের** (Ore Berth) কথা।

এখানে আছে: ক) একটি অত্যাধুনিক মেক্যানিকাল প্ল্যান্ট যা দিয়ে ঘণ্টায় ৫০০০ মেট্রিক-টন লৌহ-আকর জাহাজে তোলা যায়। এর ক্ষমতা কালে কালে বাড়িয়ে ৮০০০ পর্যন্তও করা যাবে; এমন ব্যবস্থা আছে। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত আছে।

খ) ওয়াগন টিপার (Wagon-tripper) অর্থাৎ ওয়াগনের মুখ যান্ত্রিক উপায়ে খুলে ফেলে মাল যথাস্থানে নামিয়ে রাখার ব্যবস্থা। এর ক্ষমতা ঘণ্টায় ১৫০০ মেট্রিক টন।

গ) তারপরে আছে কনভেয়র বেল্ট (Conveyor belt), যার দ্বারা বাহিত হয়ে লৌহ-আকরগুলো যন্ত্রের মধ্যে যাবে, যে যন্ত্র তাকে পৌছে দেবে জাহাজের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায়।

ঘ) মাল সাজিয়ে রাখার ও পরিষ্কার করার যান্ত্রিক পদ্ধতি (Stacker-cum-reclaimer) যার ক্ষমতাও ঘণ্টায় ১৫০০ মেট্রিক-টন।

ঙ) শিপ লোডার (Ship Loader) :-এটিই আসল যন্ত্র যে মাল ভরবে জাহাজের খোলে। এর ক্ষমতা ঘণ্টায় ৩০০০ মেট্রিক-টন।

২) **কয়লার ঘাট (Coal Berth)** : এখানে আছে নীচের যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলো যা দিয়ে জাহাজে সহজেই কয়লা ভরা যাবে :

ক) একটি মেক্যানিক্যাল প্ল্যান্ট যার ক্ষমতা—সাধারণ এবং আধুনিক বৃহৎ জলযানে কয়লা ভরতে পারে প্রতি ঘণ্টায় ২০০০ মেট্রিক-টন।

খ) এর সহযোগী ওয়াগন ট্রিপার আছে, যার ক্ষমতা ঘণ্টায় ১৫০০ মেট্রিক-টন।

গ) কনভেয়র বেল্ট।

ঘ) স্ট্যাকার-কাম-রিক্লেমার অর্থাৎ মাল সাজিয়ে রাখার ও পরিষ্কার করার যান্ত্রিক পদ্ধতি। এই যন্ত্রের সাজিয়ে রাখার ক্ষমতা হচ্ছে ঘণ্টায় ১৫০০ মেট্রিক-টন এবং পরিষ্কার করার ক্ষমতা হচ্ছে ১০০০ মেট্রিক-টন।

ঙ) জাহাজে কয়লা ভরবার মূল-যন্ত্র 'শিপ-লোডার' আছে। ক্ষমতা হচ্ছে ১৫০০ মেট্রিক-টন।

৩) **সার ঘাটা (Fertilizer-Berth)**

ক) এখান থেকে হলদিয়ার হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশনের তৈরী বিভিন্ন সার যথা, ইউরিয়া, মিথানল, সোডা-এ্যাশ ইত্যাদি জাহাজে ভর্তি হবে এবং কাঁচামাল হিসেবে রক-ফসফেট, সালফার ইত্যাদি নামানো হবে জাহাজ থেকে। এখানে সাধারণ জাহাজ থেকে যেমন নামানো-ওঠানোর কাজ করা যাবে, তেমনি যাবে বিশাল আধুনিক জাহাজ থেকেও। নামানো-ওঠানোর ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে ঘণ্টায় ১৪০০ মেট্রিক-টন।

খ) এখানে আছে বিশাল লম্বা কনভেয়র বেল্ট, ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী থেকে একেবারে জাহাজঘাটা পর্যন্ত। মাল ফ্যাক্টরীর গুদাম থেকে আপনা আপনিই পরিবাহিত হয়ে জাহাজে ভর্তি করবার যন্ত্রে এসে পড়বে। ঘণ্টায় ১৩০০ মেট্রিক-টন পরিবহন ক্ষমতাযুক্ত এই বেল্ট।

গ) শিপ-লোডার : এই যন্ত্রের ক্ষমতা ঘণ্টায় ৭০০ মেট্রিক-টন।

ঘ) গুদাম-জাত করবার ব্যবস্থা (Storage System) : এখানে সার বা কাঁচামাল গুদাম-জাত করবারও ব্যবস্থা আছে। খোলা আকাশের নীচেও মাল রাখবার সুবন্দোবস্ত আছে। গুদামে ৩০,০০০ মেট্রিক টন আর বাইরে

১৫০০০ মেট্রিক টন মাল এখনই রাখা যায়। পরে, বাড়িয়ে তা ডবল করার পরিসর রয়েছে।

৪) **ফিঙ্গার জেটি (Finger Jetty)** : এখানে 'গ্রাব-ব্রিজ-ক্রেন' আছে। যা দিয়ে লবন, গন্ধক ও অন্যান্য ভারী মাল জাহাজ থেকে নামিয়ে বজরায় ভরে পাড়ে আনা যাবে অথবা দরকার ও সুবিধামত মাল নামিয়ে আনা যাবে ডকের তীরবর্তী ভূমিতে।

৫) **দুটি সাধারণ মাল ওঠানো-নামানোর ঘাট (Two General Cargo Berth)**

ক) এই বার্থ দুটির প্রত্যেকটি ১৪৪০ ফুট লম্বা। ডকের পারে, প্রশস্ত জায়গা আছে ১২০ ফুটের মতন, সেখানে সরাসরি রাস্তাও যেমন চলে এসেছে তেমনি এসেছে রেললাইনও, যার সাহায্যে দেশের প্রতিটি শহরে মাল দ্রুত পৌঁছে যাবে।

খ) যেহেতু এখানে প্রচুর ও বিভিন্ন ধরনের মাল নামবে, সেগুলোকে যথাযথভাবে রাখার জন্য বিশাল শেডেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আধুনিক শেডের ফ্লোর স্পেস ১,০০,০০০ বর্গফুট।

৬) **কনটেনার টারমিনাল (Container Terminal)**

এই পদ্ধতিটিই হচ্ছে বন্দরে মাল ওঠানো-নামানো ব্যবস্থার সর্বাধুনিক পদ্ধতি। ব্যাপারটা একটু বিশদ ভাবে বলা যাক। জাহাজে আলগা মাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে, যেমন জায়গার অপচয় হয়, তেমনি ওঠানো-নামানোর সময়ও অসুবিধা হয়। এবং নামানোর পর কোন মাল কোথায়, তাদের খুঁজে পেতেও সময় ব্যয়িত হয় বৃথা। এটা তো ঠিক, 'সময়ই টাকা'। সুতরাং বন্দরে মাল ওঠানো-নামানোর পদ্ধতি নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা উদ্ভাবন করলেন পদ্ধতিটি। ব্যাপারটা কিন্তু সোজা ও সহজ। সত্যি বলতে কি এটি অর্থাৎ কনটেনারটি একটি বাক্সবিশেষ। একই মাপের হওয়া চাই সবগুলো বাক্স। পৃথিবীতে এর সাইজ স্ট্যাণ্ডারডাইস্‌ড করা আছে। এর চার কোণায় চারটি ধরবার বিশেষ জায়গা থাকবে, যার উপর ক্রেনের লিফ্‌টিং-বিমটি গিয়ে উপস্থিত হলেই, লিফ্‌টিং বিমের সাথে কনটেনারের ধরবার জায়গাটি আটকে যায়। ব্যস্, এইবার কনটেনারটি ওপরের দিকে তুলে নিয়ে আসুন গুদামের দিকে, মাটিতে নামিয়ে দিন। মাটিতে নামানোর পর একটু 'লুজ' দিলেই

আপনাআপনি বিমটি খুলে আসবে কনটেনার থেকে। আর যেটুকু কারিকুরি দরকার, কনটেনার ক্রেনের ওপরের কেবিনে যে ক্রেনচালক বসে আছেন, তিনিই তা করতে পারবেন। এই কনটেনার একটির ওপর একটি বসানো যায়। সুতরাং জায়গার সমস্যার সমাধান হলো। কনটেনার বা বাক্সগুলো সরাসরি, লরী বা রেল ওয়াগনেও সাজিয়ে দিতে পারা যায়। এর বাহু এতই বড় যে জাহাজ থেকে উঠিয়ে মালগুলো ডকের পাড়ে ৩০০ ফুট দূরত্বে এনে ফেলা যেতে পারে। এই পোর্ট টাইপ কনটেনার ক্রেনগুলো যাকে 'পোর্টট্রেনার' ক্রেন (Port-trainer crane) বলা হয়, যা লোহার চাকার ওপর ভর দিয়ে, অনায়াসে মাল খালাস বা ভর্তি করতে পারে এবং মালগুলো ইয়ার্ডে সুন্দরভাবে একটার ওপর একটা সাজিয়ে রাখতে পারে, দরকার হলে পরপর লরীতে বা ওয়াগনে সরাসরি ভরে দিতে পারে। ইয়ার্ডে যে মালগুলো সাজানো হলো, সেগুলিকে গুদামে নিয়ে সাজিয়ে রাখার দরকার হলে আর এক ধরনের ক্রেন, যাকে বলে ট্রান্সটেনার (Transtainer) ক্রেন দরকার। এগুলোতে লোহার বা রাবার টায়ারের চাকা লাগানো থাকতে পারে। রাবারের চাকা থাকলে ভাল, যে কোন দিকে এর গতি সহজেই ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে। ভারতবর্ষের মধ্যে হলদিয়াতেই প্রথম এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। একসঙ্গে ১০০০ কনটেনার বা বাক্স রাখার মতো জায়গা এখানে আছে, যার ফ্লোর-স্পেস হলো ১,৮০,০০০ বর্গফুট। এখন অবশ্য কলকাতা এবং মাদ্রাজ বন্দরেও এইরকম কিছু-কিছু ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

বন্দরকে আরো বাড়ানোর সুযোগ এখানে আছে। বন্দরের কথা তো অনেকটা বলা হলো, এবার হলদিয়া টাউনশিপের কথা বলবো। তার আগে বলা ভাল হলদিয়া প্রকল্পটি আমাদের স্বনির্ভরতার একটি স্বাক্ষর কারণ এই বন্দর তৈরী করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি ডক নির্মাণের ও পণ্য বোঝাই-খালাসের নানা যন্ত্রাদি নির্মাণের প্রয়োজনীয় স্বদেশী কারিগরী-দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।

এখন হলদিয়া বন্দরের টাউনশিপের কথা বলা দরকার। বন্দর কর্তৃপক্ষ বাসস্থানের ব্যাপারটা বন্দর থেকে যেন কিছুটা দূরে রেখেছেন। ভালই করেছেন। এতে বন্দর ও শিল্পসংস্থা সম্প্রসারণের যেমনি একটা বিরাট সুযোগ থাকবে তেমনি, কারখানার ধোঁয়াও বাসস্থানকে জড়িয়ে ফেলতে পারবে না। বায়ুদূষণের ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের দেশের ডেভলপমেণ্ট-বিশেষজ্ঞরা যে সজাগ হয়েছেন

তারই স্বরূপ ধরা পড়েছে হলদিয়া টাউন-প্ল্যানিংএ। হলদি নদীর ধারে সুন্দর কোয়ার্টারগুলো। রাস্তা পরিষ্কার, ঝকঝকে, যেমন চওড়া দরকার তেমনি, জলের জন্য মাঝে-মাঝেই ওয়াটার ট্যাংক চোখে পড়বে। গাছপালাও মনোরম। একটি অসুবিধা বাড়ীঘরের ব্যাপারে, এখানের জলে ও বাতাসে বড্ড নুন থাকায় বাড়ীর বেশ ক্ষতি হয়। বাড়ীর প্লাস্টার খসে যাচ্ছে বেশিরভাগ কোয়ার্টারেরই। এ ব্যাপারে কেমিক্যাল বিশেষজ্ঞদের নজর দিতে হবে, বিশেষত হলদিয়া যখন প্রধানত রাসায়নিক শিল্পভিত্তিক শিল্পাঞ্চল হয়ে দেখা দেবে অদূর ভবিষ্যতে। এখন যেটুকু হয়েছে তার মধ্যেও রসায়ন শিল্পই প্রধান বলতে হবে। কিন্তু সব চাইতে সুন্দর হলো হলদি নদীর পাড় বা বাঁধ। প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক ভ্রমণের পক্ষে আদর্শ ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। এদিকটা আরো সুন্দর হয়ে কলকাতার গঙ্গার ধারের মতো হয়ে উঠবে। বাবুঘাট থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত জায়গার কথাই বলছি। এদিকটাও যেমন, দুর্গাচক, বাসুদেবপুরের দিকেও তেমন ধীরে ধীরে পরিকল্পনা মতো জনবসতি বা টাউনশিপ গড়ে উঠবে। এজন্য 'হলদিয়া ডেভলপমেণ্ট অথরিটি' অনেক প্রকল্পই হাতে নিয়েছেন যেমন—

বাজার হাট :

১। দুর্গাচক সুপার মার্কেট নির্মাণ—মোট ব্যয় ৬৮·০০ লক্ষ টাকা।
২। দুর্গাচকে সব্জীবাজার (৭২টি স্টল)—" ২·০০ " ।
৩। দুর্গাচক স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্টল— " ২·৭৫ " ।

রাস্তাঘাট :

১। দুর্গাচক–তমলুক রোডের প্রশস্তীকরণ ও শোভায়ন— " ৪৫·০০ " ।
২। চৈতন্যপুর-কুঁকড়াহাটী রোডের প্রশস্তীকরণ— " ৭·০০ " ।
৩। দুর্গাচক রেল স্টেশনের সংযোগকারী রাস্তানির্মাণ— " ৫০·০০ " ।
৪। কুঁকড়াহাটী জেটি নির্মাণ— " ২·০০ " ।
৫। বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তার প্রশস্তীকরণ ও উন্নয়ন— " ১৬·৮৩ " ।

জলসরবরাহ ও পানীয় জল প্রকল্প :

১। গ্রামীণ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ১২০টি নলকূপ স্থাপন— " ১৫'০০ " ।

২। ২ কোটি গ্যালন গেঁওখালি জল সরবরাহ প্রকল্প— " ১৬০০.০০ " ।

৩। ১০ কোটি গ্যালন উলুবেড়িয়া জল সরবরাহ প্রকল্প— " ৭২০০'০০ " ।

প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ :

১। দুর্গাচকে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ— " ৪.৬২ " ।

২। দুর্গাচক ও হলদিয়া থানা ভবন নির্মাণ— " ৩০.০০ " ।

৩। মহকুমা প্রশাসন ভবন নির্মাণ—আনুমানিক ব্যয়—৩৬'০০ লক্ষ টাকা।

৪। সার্কিট হাউস ভবন নির্মাণ— " —৩৫'০০ " ।

৫। অগ্নি নির্বাপক প্রকল্প ভবন নির্মাণ— " —২০'১০ " ।

জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা :

হলদিয়ার জল নিষ্কাশনের জন্য আছে গ্রীনবেল্ট ক্যানেল যা প্রায় দুর্গাচকের মুখ থেকে আরম্ভ হয়ে হলদিয়ার সমস্ত শিল্পাঞ্চলকে বেল্টের মতো ঘিরে হুগলীতে গিয়ে পড়েছে। এর পাশ দিয়েই দুর্গাচক থেকে হলদিয়া যাবার প্রধান সড়ক। রাস্তাটি প্রশস্ত। ক্যানেলটিও বেশ চওড়া এবং গভীরতাও মন্দ নয়, যার জন্য ক্যানেলের মুখে স্লুইস-গেট বসিয়ে জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থাকে ঠিক রাখতে হয়েছে।

এখন দুর্গাচক শহর এলাকার (৫০০ একর) জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার রূপায়নের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫'০০ লক্ষ টাকা।

স্বাস্থ্য :

১। বাসুদেবপুরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট রাজ্য হাসপাতাল। আনুমানিক ব্যয় ২৮০'০০ লক্ষ টাকা।

২। দুর্গাচক আবাসন কেন্দ্রস্থিত রাজ্য সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস এবং রক্তদান স্থাপনের মোট ব্যয়—১'০০ লক্ষ টাকা।

আবাসন :

১। দুর্গাচকে ২০০ সংখ্যক ফ্ল্যাট নির্মাণ—মোট ব্যয় ১০০'০০ লক্ষটাকা।

২। বাসুদেবপুরে ২০০ ফ্ল্যাট নির্মাণ—মোট ব্যয় ১৫০'০০ লক্ষ টাকা

শিক্ষা :

১। দুর্গাচকে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ—২১'০০ লক্ষ টাকা।

পুনর্বাসন :

১। দুর্গাচক পুনর্বাসন কলোনীর রাস্তাঘাট উন্নয়ন—আনুমানিক ব্যয় —৫০'০০ লক্ষ টাকা।

২। পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত ৫০ একর জমির উন্নয়ন—আনুমানিক ব্যয় —২০'০০ লক্ষ টাকা।

(দুর্গাচকে ১৪ একর জমির উন্নয়ন ও বিবেচনাধীন)

অবসর বিনোদন ব্যবস্থা সমূহ :

১। দুর্গাচক অবসর বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ—আনুমানিক ব্যয়—৪'০০ লক্ষ টাকা।

২। দুর্গাচক শিশু উদ্যান নির্মাণ " —৪'০০ " টাকা।

৩। দুর্গাচক স্টেডিয়াম নির্মাণ—মোট ব্যয় —৮'২০ লক্ষ টাকা।

৪। ব্রজলালচক সমষ্টি বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ—৪.০০ " টাকা।

৫। বাড় সুন্দরা শিশু উদ্যান নির্মাণ— '৫০ " টাকা।

৬। অডিটোরিয়াম ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ (বিবেচনাধীন)—আনুমানিক ব্যয় ৪০'০০ লক্ষ টাকা।

এছাড়াও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, রিক্সা স্ট্যাণ্ড, বাস টার্মিনাস ইত্যাদি বহুবিধ প্রকল্প হলদিয়ার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম। এ হলো হলদিয়াকে ঘিরে উন্নয়ন ব্যবস্থার কথা; হলদিয়ার জন্যে রাস্তা, সেতু ও রেলপথের কী উন্নয়ন করা হয়েছে বা হচ্ছে তা একটু খতিয়ে দেখা যাক না কেন!

এ ব্যাপারে প্রথমেই মনে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কথা। হলদিয়ার সঙ্গে কলকাতা বা দেশের অন্যান্য স্থানের রেল যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু রেল যোগাযোগ না থাকলে, পথের যোগাযোগ না থাকলে একটি বন্দর, বন্দরের রূপ কিছুতেই নিতে পারে না। এ ব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কৃতিত্ব বড় কম নয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ তিনটি বন্দর বিশাখাপত্তম, পারাদীপ ও হলদিয়াকে পূর্ণভাবে এবং কলকাতা বন্দরকে আংশিক ভাবে পরিসেবিত করছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ওপর পাঁশকুড়া একটি অন্যতম স্টেশন। ১৯৭৫ সালে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পাঁশকুড়া থেকে হলদিয়া পর্যন্ত রেল লাইন সংযোগ করা হয়েছে। ৭১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এই রেলপথটি হলদিয়াকে দেশের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়া ওয়েল রিফাইনারীর ২০০ ট্যাঙ্ক ওয়াগন দৈনিক যাতায়াত করছে এই পথে। প্রায় ১০০ টন কয়লাও দৈনিক এই পথে যাচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের তো কথাই নেই। হলদিয়ায় আজ রেল নেট-ওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। সূচনায় হলদিয়া হাওড়ার মধ্যে কোন সরাসরি প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না। ১৯৭৬ সালে হাওড়া ও হুগলীর মধ্যে সরাসরি ই, এম, ইউ সার্ভিস প্রবর্তন করেন। ফলে এই এলাকার অধিবাসীরা লাভবান ও উপকৃত হয়েছেন।

৪১ নং জাতীয় সড়ক যার নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছিল গোড়া থেকেই, তা প্রায় সম্পূর্ণ। কোলাঘাটের কাছে বোম্বে রোডের সাথে এই রাস্তা এসে মিলেছে মেচেদা হয়ে। সড়ক পরিবহনের এই হচ্ছে প্রধান রাস্তা। তমলুক মহিষাদল, চৈতন্যপুরকে এই রাস্তা সমৃদ্ধ করবে ভবিষ্যতে। মাল পরিবহন ছাড়াও ১৯টি রুটের বাস এখনই হলদিয়া আসছে। হলদি নদীর ওপর হলদিয়া থেকে ওজানে একটি সেতু নির্মাণ হচ্ছে; এই সেতু হলদিয়াকে যোগ করবে দীঘা অঞ্চলের সঙ্গে এবং কলকাতা-দীঘা গাড়ি খড়্গপুর দিয়ে ঘুরে না গিয়ে যাবে হলদিয়ার প্রায় গা-ঘেঁষেই, যা এই অঞ্চলের অগ্রগতি আরো এগিয়ে দেবে এবং হলদিয়ার সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত হবে। হলদিয়া-রায়চক-কুঁকড়াহাটির পথও উন্নত হচ্ছে। কলকাতা-ডায়মণ্ডহারবার হয়ে ফেরী পার হয়ে এই পথে হলদিয়ার যে যোগাযোগ তা হচ্ছে সব চাইতে সংক্ষিপ্ত। এই পথে অনেককেই আকর্ষণ করবে হলদিয়ার দিকে। হাল্কা পরিবহনও এই পথে সহজ ও অল্প ব্যয়ে হতে পারে। সরাসরি ডায়মণ্ডহারবার হলদিয়ার মধ্যে নদী-পরিবহন সুরু হলে এ অঞ্চলের গঙ্গার উভয় উপকূলই সমৃদ্ধতর হবে। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে মৎস্য প্রকল্পেরও একটা সুরাহা হবে। ৪১ নং জাতীয় সড়ক যা যোগ করছে কলকাতা-বোম্বে রোডকে হলদিয়ার সাথে তার ওপরেই স্থাপিত হচ্ছে কোলাঘাট থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। এর কাজ আরম্ভ হয়ে কিছুটা এগিয়েছে। হলদিয়ার নিজস্ব উৎপাদন অবশ্যই আছে, কিন্তু আসল বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড। এ প্রধানতই দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের বিদ্যুৎ, যা এসেছে হাই-টেনশন লাইন দিয়ে কোলাঘাট গ্রিডের

মাধ্যমে। এই বিদ্যুতের পরিমাণ ১৩২ কে. ভি, যাকে হলদিয়ায় এনে দুরকম ভাবে বাহিত করা হচ্ছে। একটি নামানো হচ্ছে ৩৩ কে. ভি-তে আর একটিকে নামানো হচ্ছে ১১ কে. ভি-তে; তারপর বিলি করা হচ্ছে বন্দরে, শিল্পে ও টাউনশিপে।

এই ক' পাতা লিখতে যে জায়গার নামগুলো এসে গেল, আজ থেকে কুড়ি বছর পরে, আর চেনা যাবে না। এ অঞ্চলের লোকেরাও গুলিয়ে ফেলবে তার ছোটবেলার স্মৃতিগুলোকে। কাছে খড়্গপুর বিরাট রেলওয়ে জংশন, শিল্প শহর, আরো শিল্পান্বিত হয়ে উঠবে। এখানে একটি স্টিল প্ল্যান্ট কি করা যায় না? পশ্চিমবঙ্গে আর একটি দুর্গাপুর হয়ে উঠতে পারে না এটি? কাছেই তো কোলাঘাটে যথেষ্ট বিদ্যুৎ। হলদিয়া বন্দর তো হাতের কাছে। এই অঞ্চল অদূর ভবিষ্যতে 'জার্মানীর রুহ' হবে না কেন?

বন্দরের একেবারে পাশেই এবং একই সাথে, বলতে গেলে বন্দর সমাপ্ত হবার আগেই যে সংস্থাটির উৎপাদন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের শোধনাগার। মাঝে একটি বিশাল চওড়া রাস্তা, যা অয়েল জেটি পর্যন্ত চলে গেছে, পাশে খাল, রেলইয়ার্ড। ৪·৬৫ একর জমির ওপর ৮৩·৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই শোধনাগারটি গড়ে উঠেছে, যার জন্য লেগেছে ২০·৫ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা। যে শোধনাগারটি গড়ার অনুমতি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে গড়িমসি করেছেন। হলদিয়া বন্দর হওয়াতে সেটি হবার আর বাধা থাকল না—সেই প্রকল্পই আসামে তেল অবরোধের সময় বারউনি থেকে কানপুর পাইপ লাইনে তেল পাঠিয়েছে; অভাব বুঝতে দেয়নি কাউকে।

এই প্রকল্পের জন্য সমুদ্রপথে হলদিয়া বন্দর দিয়ে ইরাকী অপরিশোধিত তেল আসছে অতি সহজেই ও সস্তায়। সেই তেল শোধন করে যেমন উৎপন্ন হচ্ছে কেরোসিন ও পেট্রোল, তেমনি 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসেবেও বেরুচ্ছে অনেক কিছু। কেবল বাইপ্রোডাক্ট হিসাবেই নয়, প্রডাক্ট হিসেবেই তৈরী করছে এমন কিছু যা আগে কখনো এই দেশে হয়নি। এই প্রকল্প সেক্ষেত্রে দেশের চাহিদা মিটিয়েও কিছু কিছু ভিন্ দেশে রপ্তানী করছে। পেট্রোল, কেরোসিন ছাড়াও এখানে তৈরী হচ্ছে, রান্নার গ্যাস, মোটর স্পিরিট, ন্যাপথা, এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল, জুট ব্যাচিং তেল, লুব্‌স, বিটুমেন ও ফারনেস তেল। এখানেই তৈরী হচ্ছে 'ব্রাইটস্টক' মানের লুব্রিকেটিং তেল, যা ভারতের আর কোনখানে হয় না। কোটি কোটি টাকার লুব্রিকেটিং তেল আগে আমদানী করতে হতো,

এখন তা তো আর হয়ই না, বরং ১৯৭৭-এর মার্চ থেকে কিছু কিছু বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপিত ১৯৬৭ সালে। ভারতে ইণ্ডিয়ান অয়েলের তেল-শোধনাগারের মধ্যে হলদিয়ার স্থান চতুর্থ। এটি গড়ে তুলতে ফ্রান্স ও রোমানিয়ার কারিগরী সহযোগিতা আমাদের নিতে হয়েছে; এখন ভারত পুরোদস্তর এরকম একটি প্রকল্প একাই গড়তে পারে। এখানে কাজ করছেন ১২০০ কর্মী। নিজেদের চাহিদা মতো বিদ্যুৎ, এই প্রকল্প নিজেই তৈরী করছে দুটো টার্বো জেনারেটর বসিয়ে। যার পরিমাণ ২০/২১ মেগাওয়াট।

এই তেল শোধনাগারকে ভিত্তি করেই অনেক সহায়ক শিল্প গড়ে উঠতে পারে; সেই বিখ্যাত পেট্রো-কেমিক্যালের ভিত্তিও বলতে গেলে এই Oil Refinery বা তেল শোধনাগার। তাছাড়াও নানা রাসায়নিক জিনিস, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠতে পারে এই শোধনাগারকে ঘিরেই।

অয়েল রিফাইনারীর পাশেই, দুর্গাচকের দিকে গড়ে উঠেছে, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশন লিমিটেডের হলদিয়ার সার শিল্প সমাহার। আশা করা যাচ্ছে কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। উৎপাদন শুরু হবার মুখে এই প্রকল্পে তৈরী সুষম ও ইউরিয়া একদিকে যেমন বাড়তি প্রায় ২২ লক্ষ টন ফসল উৎপাদিত হতে সাহায্য করবে, অপর দিকে তেমনি, সোডা-অ্যাশ, মিথানল ও বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড ও রাসায়নিক দ্রব্যকে ভিত্তি করে এই প্রকল্প পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক শিল্পায়নের পথে ধাত্রী হিসেবে কাজ করবে।

এখন দেখা যাক, সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত, এই প্রকল্প কী ভাবে তুলে আনছে আমাদের সামনে :

বার্ষিক উৎপাদন (মেট্রিক টন)

সার—সুষম—৫,০০,০০০

সার ইউরিয়া—১,৬৫,০০০

তৈলরসায়ন—মিথানল—৪১,২৫০

ভারী রাসায়নিক - সোডা-অ্যাশ—৬০,০০০

বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় :

বছরে ৩২৫ কোটি টাকা।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি :

বছরে ২২,৫০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য।

যে সব নির্ভরশীল ও সহায়ক শিল্পে কাঁচামাল যোগাবে :

কাঁচ, প্লাই-উড, প্লাস্টিক, রং, প্রতিরক্ষা, রেজিন, বিমানের জ্বালানি, ভেষজ, সিলিকেট, কাগজ, লণ্ড্রী, বস্ত্র, সিমেন্ট, হাল্কা ইঁট, শুকনো বরফ, রবার বিস্ফোরক মেথিলেটেড স্পিরিট, কীটনাশক এবং বিবিধ রাসায়নিক শিল্প।

কর্মসংস্থানের সুযোগ :

প্রত্যক্ষভাবে—২,৩০০ জন।

নানান শিল্পে—আনুমানিক ১০,০০০ জন।

১৯৮২-র এপ্রিলেই উৎপাদন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু হয়ে যাবে। যেতো দু বছর আগেই, হল না বিদ্যুতের অভাবে, অথচ কারখানা পুরোদস্তর তৈরী। এই প্রকল্পে মোট বিদ্যুৎ চাহিদা ৫৩ মেগাওয়াট। প্রথম চাহিদাটুকু নিজেরাই করে নিয়েছে, ৩৩ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ, বাকীটুকু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে নেবে। এর উৎপাদন হবে বছরে ১০০ কোটি টাকার। এর থেকে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আসবে ৩ কোটি এবং কেন্দ্র সরকারের ঘরে জমা হবে ১৫ কোটি টাকা।

এই দুটি বিশাল শিল্পসংস্থা ছাড়াও অনেক ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে এবং উঠছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে। তবে এই সংস্থা-গুলোও কিন্তু খুব ছোট নয়। তাদের কথাই এখানে কিছু বলছি :

হিন্দুস্থান লিভার

মূলতঃ 'ডিটারজেনটের' কাঁচামাল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফসফেট বানাবার জন্য ৭৯-এর অক্টোবরে হলদিয়ায় হিন্দুস্থান লিভারের কারখানা চালু হয়। ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছে এই কারখানা। একদিকে সার কারখানা আর একদিকে বন্দর; এই কারখানার কাঁচামালের অভাব তাই হবে না। নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট আছে—সুতরাং বিদ্যুতের অভাবে এদের কাজ কোনদিন আটকে থাকবে না।

শ'ওয়ালেস

চার ধরনের কীটনাশক তৈরীর জন্য শ'ওয়ালেস হলদিয়ায় তাদের শাখা বিস্তার করেছে। উৎপাদন শুরু হয় ৮২র মার্চে। ৬ মাস বাদে শুরু হয় ব্যবসায়িক উৎপাদন। মূল প্রজেক্টের ব্যয় ৩·৪৮ কোটি টাকা। যদিও কাঁচা-

মাল অ্যালকোহল নিয়েই অসুবিধা বেশী এবং যন্ত্রপাতি সারাবার অপ্রতুলতাও এই মুহূর্তে আছে, তবুও এই কোম্পানী কিছুদিনের মধ্যেই এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া

হলদিয়াতে ক্লোরাইড ইণ্ডিয়ার ৪টি ইউনিট আছে; মোট বিনিয়োগ ২০ কোটি টাকার। কিন্তু বার্ষিক উৎপাদন ৩০ কোটি টাকার। চারটির মধ্যে একটি ইউনিট পুরোপুরি রপ্তানীর জন্যে। একটি আমদানী-বিকল্প কিছু জিনিস তৈরীর জন্যে। ভবিষ্যতে এটি রপ্তানিও করতে পারবে। আর একটি ইউনিটে তৈরী হচ্ছে উৎপাদনে সহায়তার জন্য কিছু যন্ত্রাংশ। চতুর্থ ইউনিটটি তৈরী করছে আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য ব্যাটারী। পুরোদমে সব কটি ইউনিট চালু হলে ১০০০ কর্মী চাকরী পাবে। গত ২০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে, কোন বেসরকারী নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে এতো বেশী কর্মসংস্থান হয়নি।

এই রকম ভাবে হলদিয়া ১২০ একর জমিতে ১১টি শিল্পসংস্থাকে জায়গা দিয়েছে। এই জমিগুলিতে গড়ে উঠেছে ব্যাটারি, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, পেট্রো-কারবন ইত্যাদি তৈরীর কারখানা। এমন কী হোটেলও। ১৫০ একর জমি এই সব বেসরকারী শিল্পসংস্থাগুলি চান, যাতে তারা ভাল করে হলদিয়াতে জাঁকিয়ে বসতে পারেন।

সব চাইতে বেশী যে শিল্প সংস্থাটির কথা শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় রাইটার্স এসেম্‌ব্লি পার্লামেন্ট যে সংস্থাটির কথায় সরগরম তার বিকাশ কিন্তু হলদিয়ায় এখনো ঘটেনি। তবু নব অরুণোদয়ের আশায় রাত্রি যাপন করছে পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষ। এই সংস্থাটি গড়ে উঠলে, ওষুধ তৈরী শিল্প, যাতে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ছিল একদিন, ধাক্কা খেয়ে একদম পেছনের সারিতে পৌঁছে গেছে, তার নবজাগরণ হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে এই সংস্থাটির নব উন্মেষের দিকে। এটি হচ্ছে **হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস**:

এই প্রকল্পটির জন্য রাজ্য সরকার ৮৫০ একর দামী জমি অধিগ্রহণ করে রেখেছেন। এর মধ্যে ২৫০ একর জমি লাগবে এই প্রকল্পের প্ল্যান্টগুলি তৈরী করতে। যাতে এই প্ল্যান্টগুলি থেকে আশে পাশে কোন বিপদ ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য দরকার হবে ২০০ একর খালি জমি। আর বাকী জমিটা সম্ভবত এঁরা দেবেন তাঁদেরই যাঁরা এই শিল্পে জাত কাঁচামাল থেকে নানারকম মাঝারি ও ছোট শিল্প গড়ে তুলতে চান।

এই যে পেট্রো-কেমিক্যাল প্রজেক্ট এর জন্য ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা হবে। যদিও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই বিদ্যুৎটুকু দেবেন, তবু যাতে নিজেরা হঠাৎ বিপন্ন না হয়ে পড়ে, সেজন্য ১৫/১৭ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নিজেরাই বসিয়ে নিচ্ছেন।

এই সংস্থাটির গড়ে ওঠা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কথা এবং ফাইল চালাচালি চলছে; এখনও 'বিশেষ' রূপ নেয়নি। শেষ পর্যন্ত প্ল্যান্টগুলি কতদূর এগোবে, তা বলা না গেলেও আশা করা যায়, শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 'গ্রীন সিগন্যাল' দেবেনই এবং একবার কাজ আরম্ভ হলে তিন বছরের মধ্যে প্ল্যান্ট বসে উৎপাদন আরম্ভ হয়ে যাবে।

হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্সএ থাকবে ৭টি বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ইউনিট।

১। ন্যাপথা ক্র্যাকার (Naptha Cracker)
২। এইচ, ডি, পি (H. D. P)
৩। ভিনিল ক্লোরাইড-মনোদার (Vinyl Chloride-Monother)
৪। পি, ভি, সি (P. V. C)
৫। এথিলিন অক্সাইড (Ethyline Oxide)
৬। গ্লাইকোন (Glycone)
৭। এথিলিন-হেক্সানল (Ethyline-Hexanole)

প্রথমে এই সংস্থা তৈরী করবে: এথিলিন বছরের ১৫,০০০ মেট্রিক টন; এথিলিন অক্সাইড-বছরে ৩,০০০ মেট্রিক টন, এথিলিন গ্লাইকোন-বছরে ২৫,০০০ মেট্রিক টন, প্রোপাইলিন ৩০,০০০ মেট্রিক টন; এথিলিন ক্লোলন ২১,০০০ মেট্রিক টন এবং বুটাডিন বছরে ১৬,০০০ মেট্রিক টন।

এই সংস্থা যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করবে সেই পদার্থগুলি ব্যবহার করবার জন্যও অনেক নতুন রসায়নিক কারখানা গড়ে উঠতে পারে। আবার ঐ কারখানার সাহায্যকারী সংস্থা হিসেবেও অনেক মাঝারি ও ছোট কারখানা সৃষ্টি হতে পারে। এই সংস্থা ও এই প্রকল্পকে ভিত্তি করে যে সমস্ত কারখানা গড়ে উঠবে, তাতে আনুমানিক ২,০০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে। মূলধনের ৪০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, ৪০ শতাংশ দেবেন রাজ্য সরকার আর বাদবাকী ২০ শতাংশ জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া হবে শেয়ার বিক্রী মারফৎ। আর যে ওষুধ তৈরী শিল্প বাংলার নিজস্ব ছিল, তার আবার বিকাশ

হবে। এই দুটি কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে 'হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল্‌স্ প্রকল্পের' দিকে।

দেশের প্রান্তিক বন্দর, এই কলকাতা-হলদিয়া। সুতরাং কলকাতার মতো স্বভাবতই হলদিয়া বন্দর জাহাজ মেরামতী করার দাবী করতে পারে। এ দাবী ন্যায়সঙ্গত তো বটেই, কোন দাবীই নয়। কলকাতা বন্দরে যে ৭টি ড্রাইডক আছে সেখানের প্রত্যেকটিতে ১৫,০০০ ডেড-ওয়েট-টনের জাহাজ মেরামতী করা যেতে পারে। কিন্তু হলদিয়াতে তো আসবে এর চাইতে অনেক বড় জাহাজ এবং স্বভাবতই কলকাতা পর্যন্ত তাদের নিয়ে যাওয়া যাবে না মেরামতীর জন্য, আর কেনই বা নেওয়া হবে শুধু শুধু পয়সা খরচ করে অতটা উজানপথ। সুতরাং হলদিয়ায় ৫০,০০০ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট জাহাজ মেরামতীর 'ড্রাইডক' নির্মাণ, অন্তত দুটি তো একান্ত দরকার এবং ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত।

জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে ড্রাইডকের গুরুত্ব অপরিসীম। এ শিল্পের একটি প্রয়োজনীয় দিক হলো কোন জাহাজের পক্ষে সমুদ্র গমন সম্ভব কিনা তা খুঁটিয়ে দেখা এবং আনুষঙ্গিক মেরামতী কাজ করা। যাত্রীবাহী জাহাজ-গুলিকে সাময়িক তদারকী ছাড়াও প্রতি বছরে অন্তত একবার এবং পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে প্রতি চার বছরে একবার করে মেরামতী কাজ করবার জন্য ড্রাইডকে নিয়ে আসা দরকার। একটি দেশের ভিতরে প্রান্তিক বন্দর হিসেবে এ ব্যবস্থা থাকতেই হয় যাতে সমুদ্র যাত্রার শেষে একবার 'চেক-আপ' হতে পারে, তা ছাড়া বিদেশী জাহাজও তাদের যাত্রার শেষে বন্দরটিতে এসে এই প্রয়োজন অনুভব করে। এটি একটি পৃথিবীময় রুটিন মাফিক ব্যবস্থা সেজন্যই পূর্ব উপকূলে কলকাতা এবং পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই বন্দরে এ ব্যবস্থা আছে। তাছাড়াও বিশাখাপত্তনে ড্রাইডক করা হয়েছে, যেখানে জাহাজ মেরামতী করে অনেক বিদেশী মুদ্রা আসছে; এবং অন্য দেশের বন্দরে আমাদের জাহাজ মেরামতীর জন্য যে বিদেশী মুদ্রা খরচ হচ্ছে, এই দিয়েই তা শোধ করা যাচ্ছে। আমাদের জাহাজ তো অনেক সময় সিঙ্গাপুর এমন কী জাপানেও মেরামতীর জন্য পাঠানো হয়। হলদিয়ায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ মেরামত করবার ব্যবস্থা হলে, শুধু নিজেদের জাহাজই মেরামত করে পয়সার, বিশেষ করে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে না, অনেক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাবে। জাহাজ মেরামতী কাজে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রাচুর্যময় সম্ভাবনাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে হলদিয়ায় যে ড্রাইডক হবে, সে বিষয়ে কোন

সন্দেহই নেই। এতে হলদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব ভারত উপকৃত হবে। আরও সুখের কথা, এই শিল্প সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় কারিগরদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় শ্রমিক দ্বারাই নির্মিত হতে পারে।

কিন্তু একটি ব্যাপারে অসুখী বোধ করছি। হলদিয়ায় কেন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হবে না! হলদিয়ায় জাহাজ নির্মাণের কথা উঠলেই কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, ওখানে জাহাজ মেরামতীর করার ব্যবস্থা হবে, ওখানে জাহাজ নির্মাণ করার দরকার কী, বরং অন্য বন্দরে বা কোথাও জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র খোলা যাক। এ ব্যাপারে মনে হয় তাদের পক্ষপাত পারাদীপ বন্দরের প্রতি। পারাদীপে যদি জাহাজ নির্মাণ হয় হোক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু হলদিয়ায় নয় কেন? কারণ কী রাজনৈতিক! অর্থনৈতিক নিশ্চয়ই নয়। সরকার তো একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র খুলতে চানই। কারিগরী দিক ভেবেই তাহলে অগ্রসর হতে হয়। আর সেদিক দিয়ে বিচার করলে হলদিয়ার স্থান সর্বাগ্রগণ্য।

কেন সর্বাগ্রগণ্য? এ ব্যাপারে হলদিয়াকে সুবিধে দিয়েছে তার ভৌগোলিক পরিবেশ এবং প্রকৃতি। যোগাযোগ, রেলপথ, স্থলপথ, জলপথ সবই একটা জালের মতো বিস্তার করে আছে হলদিয়াকে ঘিরে। দরকার হলে আকাশ পথের ব্যবহারও করা যেতে পারে। বিরাট শহর ও বাণিজ্যস্থান কলকাতা হলদিয়ার পাশেই। আবার বলছি, এই হলদিয়া ও কলকাতা দুটিই পরিপূরক বন্দর। যদি একে ক্যালদিয়া বলা হয় ও সেভাবে এর অর্থনীতি চলে তবে ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে আবার প্রতিষ্ঠা পাবেই। বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রি-এর চার পাশে। পাঁচ পাঁচটি ষ্টীল প্ল্যাণ্ট হাতের কাছে, কয়লা অনতিদূরে; আর জল; জলতো এর চার পাশে— নোনা ও মিঠা। হলদিয়ার পাশ দিয়ে বিরাট চওড়া গঙ্গা প্রবাহিত; এই গঙ্গার ওপারেই ডক বা বন্দর। ড্রেজিং করা চ্যানেলে বিরাট বিরাট জাহাজ ঢুকছে বেরুচ্ছে। উজানের দিকে চলে যাচ্ছে কলকাতা পর্যন্ত, ভাটিতে বিশাল সমুদ্র। এই গঙ্গার সাথেই হলদিয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে মিশেছে হলদি নদী। ছোট নয় বড় নয়, যেমনটি দরকার, যেমনটি মানায় ঠিক তেমনি। ওপারে শুধু সবুজ শস্যে ভরপুর; চোখ জুড়িয়ে যায়। অচঞ্চল নদী। জাহাজের ভীড় নেই লঞ্চের তেমন আনাগোনাও নেই। দু'একটা নৌকো চলছে এদিকে ওদিকে। দু-একটি যাচ্ছে এপার থেকে ওপারে। ট্রাফিক একদমই নেই। এইতো আদর্শ পরিবেশ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের। যদিও ৩/৪ মাত্র ড্রেজিং করে নেওয়া যায় গঙ্গার ও হলদির সঙ্গম

থেকে হলদি নদীর ভেতরে, তাহলেই তো কাজ হয়ে গেল। হামবুর্গ, লণ্ডন এই সব জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রের পরিবেশ তো এই-ই। বরং হলদিয়ায় পরিবেশ আরো ভাল।

যে পারে হলদিয়া, তার ওপারে তৈরী হতে পারে জাহাজ নির্মাণের ডক। প্রচুর জায়গা পড়ে আছে; ওখানে বানান জাহাজ তৈরীর ফ্যাক্টরী লক কেটে নিম গঙ্গা থেকে, কটা জাহাজ একবারে তৈরী করতে চান করুন না যতটা আপনার ইচ্ছা। লোহার চাদর, ওয়েল্ডিং রিভেট জোড়া দিয়ে গড়ে উঠুক এক একটা জাহাজ; চিরঞ্জীবপুরকে কেন্দ্র করে যে হলদিয়া আজ ২৫ বর্গ মাইলের, যার বন্দর এলাকা ১৪½ বর্গ মাইল, বাণিজ্য করছে ৫০ লক্ষ টনের, যার অধিবাসীর সংখ্যা আজ ২ লক্ষ ৭ হাজার, তা আরো বেড়ে যাক, গড়ে উঠুক, আর জাহাজগুলো ভাসিয়ে দিন, হলদি নদী ছেড়ে গঙ্গায়, গঙ্গা ছেড়ে মোহনার স্যাণ্ডহেডে, মোহনা ছাড়িয়ে জাহাজগুলো ভেসে যাক গভীর সমুদ্রে দেশ বিদেশের দিকে। শুধু তার গায়ে নাম লিখে দিন, 'এস, এস, হলদিয়া'।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

1. Port Fare—A journal of Port ; Vol. XX, Nos, 7,8&9
2. Port Fare „ ; Vol. XX1V, Nos. 13, 14&15
3. Notes from Sri K. K. Basak of C. P. T.
4. বন্দরবার্তা—A journal of Calcutta Port Trust, খণ্ড ১২, নং ১০-১২
5. Specifications & Codes asper Several Indians and British Specification books.

গল্প

মফস্বল চরিত

দীপঙ্কর দাস

বিশ্ববন্ধু স্বপ্ন দেখেন

বিশ্ববন্ধু ভেবেছিলেন তিনি এখনো ঘুমের মধ্যেই তলিয়ে আছেন। এবং তাঁর এই মুহূর্তের অনুভূতিগুলি যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার হারিয়ে যাওয়া রেশ। তাই চোখ খুলে তাকাতে তাঁর একটু বেশি সময় লাগল। চোখ বন্ধ করেও তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন কোথাও যেন জল চুঁইয়ে পড়ছে।—হয়তো পাহাড়তলীর কোন শুকিয়ে আসা ঝর্ণার ক্ষীণ জলের ধারা, কিংবা প্রাচীন কোন বাড়ির ফাটা ছাদ দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা,—এরকম কিছু একটা। তারপর তিনি বুকের ওপর রাখা ডান হাত-খানা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বিছানার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর হাত চার বছরের পুত্র মিঠুনকে ছুঁয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন মিঠুনের নিদ্রিত কাদামারা শরীর নয়। অন্য কিছু, কোন নিরেট পাথরের টুকরো,—যা নাকি কোন দিন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে তাঁর পাশে এসে স্থির হয়ে গেছে।

এই রকম সব জাগতিক স্পর্শগুলি ক্ষণিকের জন্য তাঁর বিভ্রম ঘটিয়ে দিচ্ছিল। তারপর যখন চোখ খুললেন প্রথমেই তাঁর কানে বাজল বাথরুম থেকে জল ঝরার শব্দ। রত্নাকে বিছানায় দেখলেন না, তার মানে রত্না এখন বাথরুমে জল ধরে রাখায় যত্নবান।

বহুদিন বিশ্ববন্ধু বাথরুমে জল ঝরার শব্দ শোনেননি। অর্থাৎ জল যখন আসে এবং জল যখন চলেও যায় তখনো বিশ্ববন্ধুর ঘুম ভাঙে না। ড্রামে, বালতিতে, হাঁড়ি-কলসীতে জল ভরে রেখে, ষ্টোভ জ্বালিয়ে চা করে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রত্না যখন তার জল-ধাঁটা হাতখানা বিশ্ববন্ধুর নিদ্রিত শরীরের ওপর রেখে ঠেলা দিয়ে ডাকে—"এই যে গো, চা নাও।" তখন প্রতিদিন বিশ্ববন্ধুর হদিশ হয় ঘুমটা তাঁর দিন দিন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। একটু শাসনে আনতে হবে। অর্থাৎ আগামীকাল থেকে তিনি স্বাভাবিক আর দশটা সংসারী মানুষের মতো একটু আলি-রাইজার হবেন। কারণ সকালের এতখানি অংশ ঘুমের মধ্যে পার করে দেওয়ার মতো উদারতা দেখানোর মাশুল তাঁকে বেশ উচ্চ মূল্যেই শোধ দিতে হয়।

আজকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। বিশ্ববন্ধু শুনলেন বাথরুম থেকে রত্নার কাশির শব্দ ভেসে আসছে। ক'দিন ধরেই এই কাশিটা হয়েছে রত্নার। কাশির রকম-সকম ভাল ঠেকছে না। বিশ্ববন্ধুর নিজের ডাক্তারি ব্যর্থ হয়েছে। বাজারে প্রচলিত 'কাফ-একসপেকটোরেন্ট'-এর এক ফাইল শেষ হয়ে গেছে। তবু রত্নার কাশি সারেনি। এবার ডাক্তারের ভিজিট না গুণলে নয়। দেখা যাক আসছে মাসে কিছু করা যায় কি না।

আসলে আজকাল বিশ্ববন্ধুর রাতের ঘুমের চরিত্র বদলে গেছে। ঘুমটা যেমন সহজে আসতে চায় না, তেমনি সহজে ছেড়েও যায় না। সকাল বেলাটায় বিশ্ববন্ধু অনেকক্ষণ বসে বসে ঝিমোন। কপালের দু-পাশের শিরা দুটো অশান্ত হয়ে থাকে। চোখের পাতাও ভারী লাগে। তার ওপর রাত্রির ঘুমের ফাঁকে দেখা স্বপ্নের দৃশ্যাবলী তাঁর সাথে তখন এমন এক গোলক ধাঁধা খেলতে শুরু করে যার ফলে বিশ্ববন্ধুর চিন্তা সূত্রহীন হয়ে পড়ে। ঐ দৃশ্যাবলী তিনি স্বপ্নে দেখেছেন না বাস্তবে ঘটেছে, এই সংশয়ের মীমাংসাটুকুও তখন তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবশ্য একথাও ঠিক যে রোজ এক রকম স্বপ্ন তিনি দেখেন না। তবে স্বপ্নে দেখা ঘটনার বৈচিত্রতা এবং অসংলগ্নতা তাঁকে কম বিস্মিত করে না। যেমন কোনদিন রত্নার শীতল হাতের ঠেলা খেয়ে ঘুম থেকে বিছানায় উঠে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তিনি যেন স্পষ্ট টের পান কাল রাতে তিনি এক সংকীর্তনের দলের সাথে ভস্মমাখা শরীর নিয়ে

ত্রিশূল হাতে গাঁ-ঘরের দিকে গাজন পরবের ভোলানাথ সেজে নেচে নেচে পথ হাঁটছেন। এখন যেন তাঁর সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। অনভ্যস্ত পায়ে দীর্ঘ পথ হাঁটার ফল স্বরূপ দুই উরুর মাংসপেশী ব্যথায় টাটিয়ে আছে। খাট থেকে মেঝেয় নেমে দাঁড়ানোর মতো শক্তিটুকুও তাঁর আর অবশিষ্ট নেই। আবার কোনদিন সকালে চোখ মেলেই তাঁর মনে হয় তিনি কাল সারারাত একটা ইয়োতির তাড়া খেয়ে ছুটে বেরিয়েছেন। এখনো বুঝি তাঁর বুকের ভেতর আত্মরক্ষার সেই তীব্র আর্তিটুকু অবরুদ্ধ হয়ে আছে। হৃদপিণ্ডের গতিও যথেষ্ট দ্রুত। পরে—যখন সকালের এই ভ্রান্তিময় পরিমণ্ডল থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন,—ভেবে ভেবে কুল পান না। বাস্তবিক নাম-সংকীর্তনের দলের সঙ্গে ত্রিশূলধারী ভস্মমাখা গাজন পরবের মহাদেবের যে কি সম্পর্ক, এবং তিনি কি করে অনুরূপ এক মিছিলে গিয়ে হাজির হলেন। কিংবা সেই ইয়োতির তাড়া খেয়ে প্রাণান্তকর ছোটার প্রসঙ্গটাই বা কি করে তার জীবন-যাপনের নক্সার মধ্যে ঢুকে পড়ল,—তিনি বাস্তবিকই কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেন না। যেমন আজকের এই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়াটুকুকেই ধরা যাক। কলের জলের শব্দের সঙ্গে পাহাড়তলীর শুকিয়ে আসা ক্ষীণ ঝর্ণার অনুষঙ্গ এবং চার বছরের নিদ্রিত পুত্রের কোমল শরীরের স্পর্শে নিরেট পাথরের টুকরো ব'লে ভ্রম হাওয়ার মধ্যে কতটুকুই-বা সম্পর্ক আছে! বাথরুমে ঝরে পড়া জলের শব্দ হয়তো তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায় ঢুকে পড়ে পাহাড়তলীর প্রায় শুকনো ঝর্ণার রূপকল্প টেনে আনতে পারে। এবং এই ঘটনার সুপ্ত প্রবাহ হয়তো খুব একটা অসঙ্গতও নয়। বিশেষ করে গত দশ-বার বছর ধরে তিনি যখন জীবিকার বাইরের উদ্বৃত্ত সময়টায় কবিতার চর্চা করে আসছেন। তবে শিশুপুত্রের কোমল স্পর্শের সঙ্গে নিরেট পাথরের টুকরোর অনুষঙ্গ নিশ্চয় খুব স্বাভাবিক নয়।···এই সব ভাবতে ভাবতে বিশ্ববন্ধুর কপালের অনেকগুলি ভাঁজ পড়ে। খুব নির্জনতার চারপাশের জীবনপ্রবাহ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে বোধ করেন। তখন বিশ্ববন্ধুর মনে হয় তিনি বোধহয় পাগল হতে চলেছেন। দারুণ একটা ভয় তাঁর শ্বাসনালিতে রবারের বলের মতো ধাপ খেতে থাকে। সারা দিন ধাপ খায়।

বিশ্ববন্ধুর বিদায়

কলের জল চলে গেল। রত্না এখন রান্নাঘরে। স্টোভ জ্বালছে। চায়ের

কাপ-প্লেটের টুংঠাং শব্দ। বাড়ির উঠোনে নিমগাছটার ডালে কাক ডাকল। —"খা, খা"।

বিশ্ববন্ধু বুকে বালিশ রেখে উপুড় হলেন। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল। শোবার সময় বৃষ্টির ছাঁট বাঁচাবার জন্য মাথার কাছের জানালাটা বন্ধ করে শুয়েছিলেন। এখন বৃষ্টি নেই। ফিকে রোদও উঠেছে বোধ হয়। তবু ঘরের মধ্যে স্যাঁতস্যাতে অন্ধকার। সিলিং-এ ঘুরন্ত ফ্যানটায় কিচির কিচির শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বিশ্ববন্ধুর আয়েসী শরীরের সীমানা ডিঙিয়ে বুকের খুব গোপন কোণে ঢুকে যাচ্ছিল। ঐ কোণে বোধ হয় চড়াই পাখি বাসা বেঁধেছে। বাসায় চড়াই শাবক কিচ কিচ করে ডাকাডাকি শুরু করেছে।

মিঠুন উঠল। মিঠুনের ঘুম থেকে জেগে ওঠাটা খুব অতর্কিত এবং উপভোগেরও। এমনভাবে তড়িতে শায়িত অবস্থা থেকে বিছানায় উঠে বসে সে যে, মনে হয় কাল রাতে অত্যন্ত জরুরি কোন কাজ অসম্পূর্ণ রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙ্গতেই এখন সে কাজ শুরু করে দেবে। বিশ্ববন্ধুর ঠোঁটের ফাঁক গলে এক টুকরো স্নেহাশ্রিত হাসি গড়িয়ে পড়ল। মিঠুন বিশ্ববন্ধুর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা পিঠ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলো। বাবার পিঠের ওপর নিপুণ অশ্বারোহীর মতো উঠে বসে মুখ দিয়ে শব্দ করল—হাট, হাট।

—বাব্বা, আজ সূর্য কোনদিকে উঠেছে গো। বিশ্ববন্ধু রত্নার মুখ দেখলেন। মুখে চোখে যথেষ্ট জলের ঝাপটা দিলেও রত্নার মুখের ওপর থেকে বাসী ঘুমের রেশটুকু এখনো মিলিয়ে যায়নি। বিশ্ববন্ধু মৃদু হেসে রত্নার হাত থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। চুমুক দিলেন। ভাবলেন খালি পেটে এই চা খাওয়ার অভ্যাসটা ত্যাগ করা যায় না? ইদানীং তিনি খুব অম্বলে ভুগছেন। কখনো সখনো ডাক্তার-টাক্তারও দেখিয়েছেন। ফল কিছু হয়নি। ডাক্তারের অভিমত,—অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার ফলে এই নিত্য অম্বল। এ সারানো ওষুধের কাজ নয়।

—ওটার কি করবে?…ভেবে কিছু ঠিক করলে? রত্না মাথার কাছের বন্ধ জানলাটা খুলে দিল। বাইরে থেকে এক ঝলক তাজা বাতাস এসে বিশ্ববন্ধুকে ছুঁয়ে দিল। তিনি টেনে টেনে শ্বাস নিলেন। যেন খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর ছুটে আসা সকালের তাজা বাতাসকে দুই ফুসফুসে টেনে

নেওয়ার মধ্যে রত্নার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চাইলেন। পারলেন না। তাই জানলার বাইরের বৃষ্টিস্নাত ঝকঝকে সকালটাকে দেখতে দেখতে বললেন—কি সুন্দর, তাই না?

রত্নার বিশেষ ভাবান্তর হলো না। বিশ্ববন্ধুর হাত থেকে খালি কাপটা ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল - লিখে দাও, এখানে অসুবিধে আছে। অন্য কোন ব্যবস্থা করতে? রত্না হাত দিয়ে সামনের দিকে উড়ে আসা চুল ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল—তা ছাড়া আমার শরীরও আর দিচ্ছে না। এত ঝক্কি-ঝামেলা কে পোহাবে?

বিশ্ববন্ধু উত্তর দিলেন না। চা খাওয়ার পরমুহূর্তে মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। দাঁত টকে আছে। এখন একটা সিগারেট ধরালে ভাল হয়। তবু ধরালেন না। একটু পরেই প্রাতঃকৃত্য সারতে বসে সিগারেট তো লাগবেই।

—কি গো, উত্তর দিচ্ছ না যে?…বিশ্ববন্ধু দেখলেন জানলা ডিঙিয়ে এক চিলতে রোদ রত্নার মুখের এক পাশে তেরছা হয়ে পড়েছে। রত্নার মুখের এ পাশটা উজ্জ্বল, ওপাশটা ম্লান। রত্না আবার বলল—আমার মুখ থেকে এসব কথা শুনতে বুঝি ভাল লাগছে না?

আজকে একটু আগেই তো বিশ্ববন্ধু পাহাড়তলীর উপত্যকায় শুয়ে ছিলেন। আহা! কি প্রশান্তি ছড়িয়ে ছিল উপত্যকার ঘাসে। পাশেই ছিল সেই ক্ষীণ ধারা ঝর্ণার স্রোত। রত্না কি কোনদিন এমন স্বপ্ন দেখেছে? জিজ্ঞেস করবেন নাকি?

কাল চিঠি এসেছে বিশ্ববন্ধুর বাড়ি থেকে। মেজ মামা আসছেন চোখের কি যেন একটা অপারেশন করাতে। বিশ্ববন্ধুর বাড়িতে উঠবেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তো আর গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে পারবেন না। এখন তো এক রকম রোজই হাসপাতালের আউটডোরে গিয়ে দেখাতে হবে। পোষ্ট-অপারেটিভ চেক-আপ বলতে যা বোঝায় আর কি! সেই সময়টাই বিশ্ববন্ধুর বাড়িতেই থাকবেন তিনি।

চিঠি পাওয়ার পর থেকে রত্না তেতে আছে। এ যেন গলার মালা রত্নার। শ্বশুরকুলের সবাই যেহেতু দেশ-গাঁয়ে থাকেন তাই কোন প্রয়োজনে সদরে আসতে হলেই একটাই ঠিকানা মনে পড়ে সবার। ঐ বিশ্ববন্ধুর বাড়ি চল। রাত নেই, সময়-অসময় নেই। যখন খুশী, তখন আস। খাও, ঘুমাও, আবার চলে যাও। বিশ্ববন্ধুও বড় বিব্রত বোধ করেন। কিছু বলতে পারেন না। তবু রত্নার ওপর যে অত্যাচার হয়ে যায়, তার প্রতিকারও করা দরকার। লোক এলেই উনোন ধরাও, রান্না চাপাও। খাইয়ে দাইয়ে শোবার জায়গা করে দাও। রত্নারও মানুষের শরীর। যেদিন থেকে বিশ্ববন্ধু সদরে বাড়ি করে বউ নিয়ে উঠে এলেন সেদিন থেকে শুরু হয়েছে এই কাহিনী। প্রথম প্রথম রত্না মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। ইদানীং আর পারে না। ক্ষোভ, বিরক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখানে বিশ্ববন্ধুর ভূমিকা অত্যন্ত অসহায়ের।

এবার মেজ মামা আসছেন। সেবার দেশে গিয়ে শুনেছিলেন মামার চোখে কি যেন গোলমাল হয়েছে। ঠিক ছানি নয়, অন্য কি। চোখে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। একবার সদরে এসে ডাক্তার দেখিয়ে গিয়েছিলেন; অপারেশন করাতে হবে। সেবার মামার সাথে এ নিয়ে কথা হয়নি। আর কথার আছেই বা কি? মামা সদর হাসপাতালে অপারেশন করাতে এসে বিশ্ববন্ধুর বাড়ি ছাড়া আর কোথায় উঠবেন? বিশ্ববন্ধু কি জানেন না মামার কোন ছেলে নেই? দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বহুদিন। তাদের শ্বশুড়-বাড়ি দূরের জেলায়।

তবে? বিশ্ববন্ধু অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকালেন রত্নার দিকে। রত্না জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। মুখের একপাশ থেকে রোদ সরে গেছে। —এবারটার মতো মানিয়ে নাও কোন রকমে। পরে না হয় ···। বিশ্ববন্ধু কথা শেষ করতে পারলেন না। স্পষ্ট অনুভব করলেন বুকের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে গড়িয়ে যাচ্ছে অস্বস্তির একটা ভারী পাথর। মামা ইদানীং বড় খিটখিটে হয়ে উঠেছেন। বয়স-ও প্রায় সত্তর ছুঁলো। সেই মামা চোখে ঘন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছেন পাশের ঘরে। আর রত্না কোমরে আঁচল জড়িয়ে বিশ্ববন্ধুর কলেজের ভাত আর মিঠুনের স্নান-খাওয়ার তদারকি করতে করতে চরকির মতো পাক খেয়ে খেয়ে রোগীর ঘরে গরম জলটা, তোয়ালেটা, পথ্যের যোগানটা

দিয়ে চলেছে। অবিশ্রান্ত দ্রুত গতিতে পাক খেয়ে যাচ্ছে রত্না। তার কপাল স্বেদবিন্দুতে আর্দ্র, মাথার চুল আটকে আছে কপালে। চোখের নিচে ক্লান্তির ঘন কালো দাগ। আর মুখের চামড়ায় লাফিয়ে উঠেছে এক ঝলক রক্ত।··· মুহূর্তের জন্য আবেগাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন বিশ্ববন্ধু।—কি করে না করি বলতো? মিনমিন করে তার গলার নিচে শব্দ বাজল। রত্না জানলা ছেড়ে দ্রুতগতিতে দরজায় এসে দাঁড়াল। আহত স্বরে বলল—সেই তো, নিজের মামা যে।··· হতো যদি আমার কেউ, তখন দেখা যেত বারণ করার কারণের আর অভাব ঘটছে না।···রত্না আর বিশ্ববন্ধুর উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াল না। দ্রুত ঘর ছেড়ে কাজে চলে গেল।

বিশ্ববন্ধু কবিতা লেখেন।

—এসেছে?

—কি?

—কোন চিঠি?

—রোজ রোজ তোমায় কে চিঠি দেবে বলতো?

—দেবে না?···দেবার কেউ নেই বুঝি?

—ওকি কথা, দেবার কে আছে আবার?

রত্নার সাথে আর কথা বাড়ালেন না বিশ্ববন্ধু। খুব ক্লান্ত লাগছে। বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে বসে পড়লেন। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল। তাই রোদ তেমন তীব্র নয় আজ। তা ছাড়া বাড়ি থেকে বিশ্ববন্ধুর কলেজের দূরত্ব এমন কিছু নয় যে পায়ে হেঁটে এলেও শরীর মন জুড়ে এতখানি ক্লান্তি জমতে পারে। মেজ মামার ব্যাপাটার কোন মীমাংসা করে উঠতে পারলেন না এখনো। কোন মীমাংসা তিনি করেও উঠতে পারবেন না। রত্নাও বোধহয় জেনে গেছে সে কথা—বুকের বাঁদিকে চাপা একটা ব্যথা জমেছে দুপুর থেকে। চিন্তা হয় বিশ্ববন্ধুর। বুকের বাঁ দিকেই তো হৃদযন্ত্রের অবস্থান। ব্যথাটা আবার সেখানে হচ্ছে না তো! ভাবতে ভাবতে ঘন শ্বাস নিলেন বিশ্ববন্ধু। যেন হৃদযন্ত্রের যে গোপন কোণে ব্যথাটা জমেছে সেখানে কিছু বাতাস পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন। আজকের ডাকে কোন চিঠি এল না। কালকের ডাকেও আসেনি। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে কোন চিঠি,—মায় কোন শীর্ণকায় পত্রিকা না পেলে নিজেকে বড় নিস্ব লাগে। সমস্ত বিকেলটা তার চোখের ওপর দিয়ে পুড়তে

খুড়তে খসে যাচ্ছিল। মিঠুন আর রত্না একটু আগে ছাদে চলে গেছে। রত্না বোধহয় পাশের বাড়িতে ভাড়া আসা নতুন বউটার সঙ্গে আলাপ করছে। ছাদ থেকে মিঠুনের ছোটাছুটির শব্দ আসছিল। হাই তুললেন বিশ্ববন্ধু। হাত বাড়িয়ে আজকের খবরের কাগজটা নিলেন। চোখ বোলাতে বোলাতে বিশ্ববন্ধু না ভেবে পারলেন না এই কাগজের সব খবর কলকাতাবাসীরা তার চেয়ে অন্তত আট ঘণ্টা আগে জেনে গেছে। ঠিক এই রকম একটা অনুভবের সামনে এসে পড়লে বিশ্ববন্ধু টের পান তার বুকের নিচে মাটি ধ্বসে যাচ্ছে। আজ অনেকদিন ধরে তিনি কবিতা লিখছেন না। লেখার মতো যথেষ্ট যুক্তি যেন নিজের কাছেই আর দাঁড় করাতে পারছেন না। এই নিরুত্তাপ জেলা-শহর, —যেখানে শহরের সীমিত আকার আয়তনের মতোই মানুষগুলির বাঁচা-মরা সীমিত হয়ে আছে, সেখানে বসে একা একা কবিতা লেখার আর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না বিশ্ববন্ধু।

উঠোনের সীমানার পাঁচিলের ওপর একটা কাক ডাকছে দিন শেষের শঙ্খ তুলে। পাঁচিলের একটা অংশে ফাটল ধরেছে। সেই অংশটা একটু যেন বাইরের দিকে হেলেও পড়েছে। বিশ্ববন্ধু চেয়ারে বসে আকাশের গায়ে দিন ফুরোনো আলো দেখলেন। বুকের বাঁ-পাশের ব্যথাটা ফিরে ফিরে আসছে আবার। হয়ত তেমন কিছু নয়,—অম্বলের জন্যও হতে পারে। বিশ্ববন্ধু গলা চড়িয়ে ডাকলেন—মিঠুন, মি-ঠু-ন। বেড়াতে যাবি তো আয়।

মিঠুন মায়ের সঙ্গ ছেড়ে এই মুহূর্তে আর কোথাও যাওয়াটা বিশেষ লোভনীয় বলে বোধ করল না। বিশ্ববন্ধু নিজেই বেরিয়ে পড়লেন। মোড়ের মাথায় রাস্তা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ গেছে চক বাজারের দিকে। আর এক ভাগ নদীর ধারে। মোড়ের মাথায় দোকান। সিগারেট কিনলেন একটা। ধরালেন,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন বিশ্ববন্ধু।— শ্রদ্ধাভাজনেষু, আমি গত দশ বছর ধরে কবিতা লেখার চেষ্টা করে আসছি। নানান পত্র-পত্রিকা—বিশেষ করে মফস্বলের, আমার কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন। আপনার কাগজে লেখার সুযোগ ঘটেনি এখনো। দুটো কবিতা পাঠালাম। আশা রাখি ছাপবেন। বিনীত···। কত দিন আগের কথা? বিশ্ববন্ধু ভুরু কুঁচকে দৃষ্টি ছুঁচোলো করে যেন ক্যালেণ্ডারের পাতায় সময় হিসেব করছেন,—এমন করে দিন গুনলেন। প্রায় আড়াই-

তিনমাস হয়ে গেল, কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছেন না। কি লাভ আর লিখে? এই ধরায় পোড়া জেলা শহর থেকে তিনি কি কবি হয়ে উঠে আসতে চাইছেন? তাও কি সম্ভব? তিনমাস হয়ে গেলেও কলকাতার একটি পত্রিকা যখন সামান্য একটা সংবাদও যাকে পাঠায় না, সে কিনা কবি হবার কথা ভাবছে, অন্তত মফস্বলে থেকে? বিশ্ববন্ধু নিজের মনেই হাসলেন কিছুক্ষণ। যেন হাসি নয়,— তার বুকের পাঁজরা থেকে এক এক করে হাড় খসে পড়ছে।

ক'দিন আগে সিউড়ি থেকে অমলেন্দু রায় এসেছিলেন। বিশ্ববন্ধুর সমব্যথী। বলে গেছেন—আপনি শেষ হয়ে যাবেন বিশ্ববন্ধু। কলকাতা কোনদিন আপনাকে নেবে না। ওটা ওদের তালুক। ভোগ করবে ওরাই। আপনি লিখুন। লেখা বন্ধ করবেন না।

—লিখুন, লেখা বন্ধ করবেন না।···হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ববন্ধু এক সময় নদীর পথ ধরলেন। মরা নদী—গন্ধেশ্বরী। ঘন বর্ষায় হাঁটু ডোবানো জল হয়। এখন এক রকম শুকনো। ছোট শহর, রোজকার মতো বৈচিত্রহীন সন্ধ্যা নামছে। সরু সরু চামড়া ওঠা রাস্তা—দুপাশে গায়ে গায়ে বাড়ি জ্বলছে টিম টিম করে। রিকসা যায় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। বেশ ক'দিন আগে কলকাতা থেকে এক কবিবন্ধু এসেছিলেন বিশ্ববন্ধুর কাছে। বেড়াতে এসে যেন বিশ্ববন্ধুর জন্ম সার্থক করে দিয়েছেন,—এমন হাবভাব। সেই বন্ধুই বলেছিলেন,—আপনাদের গতির প্রতীকতো ঐ রিকসা। এখান থেকে আমাদের লিটারেচার আর কি একসপেক্ট করতে পারে বলুনতো? কথাটা বিশ্ববন্ধুর বুকের গভীরে গিয়ে বেজেছিল। এখানে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ত্রস্ত গতিতে ঠুং ঠাং শব্দ করে রিকসা যায়। আর কলকাতার শরীরে এখন জুড়ে দেয়া হচ্ছে সেই ডানা,—যার অপর নাম গতি। নিজে অর্থনীতির ছাত্র। বৈষম্যের কারণগুলি জানেন। এবং এই বৈষম্যের আশু প্রতিকার নেই কিছু। মফস্বল শহরগুলি কলকাতার উপনিবেশ হয়ে যাচ্ছে। একই রাজ্যে দুই শ্রেণীর নাগরিক তৈরী হয়ে গেল।

—বিশ্ববাবু নাকি?···বিশ্ববাবু দাঁড়ালেন। অবনী ঘোষাল দাঁড়িয়ে আছেন। হাসলেন বিশ্ববন্ধু,—এই একটু হাঁটছি আর কি। অবনী ঘোষাল গলা নামিয়ে ভারী স্বরে বললেন।—চিত্তবাবু তো মারা গেছেন, শুনেছেন?···

শুনেছি। আজ দুপুরে।···বড় দুর্ভাগ্যের। বিশ্ববন্ধু শূন্য গলায় সাড়া দিলেন।—রোগটা ধরাই পড়ল না। আজকের দিনে এভাবে মারা যাওয়া মেনে নেওয়া যায় নাকি, বলুন ?···অন্ধকার। পথের ধারে ল্যাম্পপোস্ট আছে একটা। আলো তো জ্বলছে। তবু ঐ আলোটুকু অন্ধকারের রহস্য বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। বিশ্ববন্ধু অবনীবাবুর কথা শুনতে শুনতে অন্য-মনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। তার বুকের বাঁ দিকে রোজ দিন শেষে একটা ব্যথা জমে। রোজ !···বিশ্ববন্ধু শুনলেন অবনীবাবু বলছেন—কলকাতা হলে অন্তত রোগটা জানা যেত।···ছোট শহর। বৈচিত্রতা নেই কোথাও। জীবন গড়ায় রিকসার চাকায় চাকায়। তাই দুপুরের মৃত্যুর খবর এখনো জলে বুদ্‌বুদ্ কাটছে। বিশ্ববন্ধু আন্তরিক গলায় বললেন।—কি আর করবেন। সবই অদৃষ্ট।

বিশ্ববন্ধু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। দূরে, নদীর বুকে কজ-ওয়ে। দুর্গাপুর গামী বাস-লরি যায়। নদীর ওপারে সিনেমা হল্। কি যেন একটা বই চলছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখলেন বিশ্ববন্ধু।—শ্রদ্ধাভাজনেষু, অনেকদিন আগে প্রায় তিনমাস আগে দুটো কবিতা পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে···। আকাশের বুকে উল্কাপাত হলো, উল্কাপাত দেখা কি শুভ, না অশুভ ! বিশ্ববন্ধু একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন। একটা চিঠি দেবেন কি কলকাতার ঐ সম্পাদককে ? নাকি নিজে গিয়ে দেখা করে আসবেন ? দুটো কবিতার জন্য এতখানি রাস্তা ভেঙ্গে কলকাতায় যাওয়া ? বিশ্ববন্ধু টের পেলেন নদীর পাড়ের নির্জনতা কখন যেন তার বুকের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। সেই নির্জনতায় মুখ ডুবিয়ে এক ন্যুব্জদেহী প্রাচীন পুরুষ ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে বিশ্ববন্ধুর নাম ধরে ডাকছে।···বিশ্ববন্ধু পাড়ের মাটি থেকে একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে মারলেন নদীর বুকে। এই চল্লিশ উত্তীর্ণ জীবনে আজকের সন্ধ্যায় বিশ্ববন্ধু যেন আবিষ্কার করলেন—এই মফস্বল শহর, তাঁর সীমিত বিস্তার, মফস্বল-কলেজে তাঁর অধ্যাপনা, তাঁর কবিতা লেখা, না লেখা, দেশ-গাঁয়ের বাড়ি, দেশ থেকে মানুষজনের তাঁর কাছে ঘন ঘন আগমন, তাদের রক্ষনাবেক্ষণ, মেজ মামার চিঠি, রত্নার অনুযোগ কিংবা মন খারাপ করা, চিত্ত-বাবুর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা সুশৃঙ্খল গোপন সম্পর্ক রয়ে গেছে। সব কিছু মিলিয়েই তিনি যেন এক খর্বকায় বিশ্ববন্ধু হয়ে রইলেন। মাথা টান টান করে আত্মপ্রকাশে, মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে

লম্বা বিশ্ববন্ধু হওয়া তাই এই জীবনে আর হলো না। এখন ন্যুব্জদেহী প্রাচীন পিতৃপুরুষের কণ্ঠে নিজের নামের প্রতিধ্বনি শোনা ভিন্ন তার আর কোন গতি নেই। এই তার নিয়তি।

রাত বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে

ঠিক মতো দৌড়ে এসেও হাতিয়া প্যাসেঞ্জার মফস্বল শহরটা ছুঁতে আধঘণ্টা লেট করে ফেলল। স্টেশন চত্বরে তখন ঝিমুনি লেগেছে। হাই তুলতে তুলতে একজন চেকার হাত বাড়ালেন বিশ্ববন্ধুর উদ্দেশে। বিশ্ববন্ধু টিকিট ফিরিয়ে দিলেন।

রিকসা ধরে বিশ্ববন্ধু যখন বাড়ি পৌঁছোলেন তখন রাত্রি প্রায় মাঝপথ হেঁটে এসেছে। শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না তখন। তবু হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলেন তিনি। রত্না সামনে উবু হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দোর দিয়ে এলেন।

মফস্বল শহরে রাত নামে একটু তাড়াতাড়ি। তাই সাড়ে এগারোটার রাত্রি যেন দম চেপে ধরেছিল বিশ্ববন্ধুকে। খেতে ইচ্ছে করছিল না। সেই ভোরবেলা বাস ধরে দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থেকে কোলফিল্ডে হাওড়া। গঙ্গার ধারে সস্তা হোটেলে মাছ-ভাত। তারপর দু-একটা পরিচিত ঠিকানা ঘুরে সম্পাদকের অফিসে। সেখান থেকে সটান হাওড়া স্টেশন। সামান্য মশলা-মুড়ি আর একটা শশা। হাতিয়া প্যাসেঞ্জারে বাড়ি।···সারা দিনের ধকলের পরিমাণ কোন অবস্থাতেও ঠিক মানুষিক নয়। তার ওপর উগ্র মশলা মিশ্রিত ঝোল-ভাত, এবং সেই সঙ্গে বিকেলে হাওড়া স্টেশনে মশলা মুড়ি,—অম্বলের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ববন্ধু ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন।

মিঠুন ঘুমিয়ে আছে। রত্না ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বুঝতে পারছেন না বিশ্ববন্ধু। তার ঘুম আসছে না। শরীরের সাধ্যের সীমানার বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করলে বিশ্ববন্ধুর এ রকমই হয়। তার ওপর আবার অম্বলের অস্বস্তি। বিশ্ববন্ধুর মনে হচ্ছিল তার মাথার ভেতর একটা উনোন জ্বলছে। উনোনের গনগনে আঁচে তার সারা শরীরের শিরা বেয়ে লাভা স্রোতের মতো তপ্ত রক্ত ছুটছে। কপালের দু-পাশের শিরা দুটো সেই উত্তাপ যেন আর সইতে পারছে না। এখনই ছিঁড়ে যাবে,—এরকম লাফাচ্ছে।

কিছুক্ষণ কাটল এভাবে। এক সময় রত্না পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল,

—কিছু হলো?

—নাহ্! সাড়া দিলেন বিশ্ববন্ধু।

অন্ধকারে মিঠুন বোধহয় পাশ ফিরল। রত্নার হাতের শাখা-চুড়ির শব্দ হলো। বিশ্ববন্ধু শব্দ করে হাই তুললেন একটা।

—দেখা করেছিলে?···রত্নার গলা খুব নিচে নেমে গেছে। বিশ্ববন্ধু গলার খাদ ততখানি নিচে নামিয়ে বললেন।—দেখা করলেন না।

—দেখা করলেন না?···তুমি বলেছিলে কত দূর থেকে এসেছ?···রত্না কি বালিশ থেকে মাথা তুলল একটুখানি? বিশ্ববন্ধু মুখের ওপর রত্নার গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া টের পেলেন।

—বলেছিলাম।

—কি বললেন?

—বলবে আবার কি, লোক দিয়ে বলে পাঠালেন ব্যস্ত আছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিশ্ববন্ধু। একটু ছেলেমানুষি করে ফেলেছেন। এতদূর থেকে সেই কলকাতার সম্পাদকের দপ্তর পর্যন্ত ছুটে যাওয়াটা, মাত্র দুটো কবিতার জন্য, ঠিক স্বাভাবিক নয়। রত্নার দিক থেকে সাড়া-শব্দ আসছে না। এ যেন কবিতা নয়, বিশ্ববন্ধু তার অন্ঢ়া কন্যার জন্য কলকাতা শহরে গিয়েছিলেন পাত্র পক্ষের সঙ্গে পাকা কথা বলতে। পাত্রপক্ষ দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন বুঝি সেই বেদনা সয়ে নেবার পালা চলছে। কি রত্না, কি বিশ্ববন্ধু শুয়ে শুয়ে নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে ঘরের গভীর রাতের অন্ধকারের ভেতর কি যেন একটা খুঁজছিলেন। ব্যথায় ব্যথায় রাত বাড়ছিল। দূরের বাড়ি থেকে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। একটা কুকুর ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল কোথায় যেন। রাত্রি গভীরতর হলো।

বিশ্ববন্ধু এক সময় নামানো গলায় ডাকলেন।—শুনছো?

—কি?

—ঘুমাওনি?

—ঘুম আসছে না।

ক্ষণিক নীরবতা, ফ্যানের কিচ্ কিচ্ শব্দ।

– আমার বোধহয় ঠিক ঠিক হয় না, না? বিশ্ববন্ধুর গলা।

—কি হয় না?

—কবিতা লেখা?

তির তির করে বুকের গোপন শিরা বেয়ে হিমশীতল রক্তের ওঠা-নামা টের পেল রত্না। বিশ্ববন্ধুর জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি আর কি দেবেন? বিশ্ববন্ধু কি তার কাছে উত্তরের প্রত্যাশায় এত বড় একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। বিশ্ববন্ধু কি জানেন না এই প্রশ্নটার উত্তর রত্না তার সমস্ত জীবন মন্থন করেও এনে দিতে পারবে না? রত্না তাই নিরুত্তর শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাশের বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে একটা মাত্র শব্দ হলো। সাড়ে বারোটা, একটা,—নাকি দেড়টা, কটা বাজে এখন? রত্না কি আজ সারারাত জেগে থাকবে? জেগে থেকে বিশ্ববন্ধুর প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বেড়াবে? আর এদিকে রাত গড়াবে, আরো একটা রাত গড়াবে শেষ রাতের নির্জনতায় শহরের বুক চিরে চিরে আদ্রার দিকে চলে যাবে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার।

বিশ্ববন্ধু কপাল টিপে শুয়ে আছেন। পাশে রত্না। মিঠুন গভীর ঘুমের অতলে। মিঠুন জাগতেও পারছে না মফস্বলের আশ্রয়ে আরো একটা খর্বকায় বিশ্ববন্ধু হয়ে ওঠার অপেক্ষায়, আত্ম-বিশ্বাসে চির ধরাবার প্রস্তুতিতে একটি রাত ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দুর্গা দত্তর কবিতা

মল্লিনাথ গুপ্ত

দুর্গা দত্তর লেখা আগে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। সম্ভবত এই প্রথম তার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন লেখকের একসঙ্গে একগুচ্ছ কবিতা ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভাব-সম্পাদক যখন কবিকে পরিচয় করার ভার আমার ওপর দিলেন, তখন কিছুটা সংশয়ই ছিল। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই দুর্গা দত্ত একেবারে তাজ্জব বানিয়ে ছেড়েছেন। (অবাক লিখলে বিস্ময়ের পরিমাপটা বোঝানো যেতো না !) এমন শীলিত, মাত্রাবোধসম্পন্ন, গভীর কবিতা অনেক চেনা পদবীর কবিও লিখতে পারলে শ্লাঘা বোধ করতেন।

আমাদের দেশে প্রস্তুতির গার্হস্থে দীর্ঘকাল থাকার রেওয়াজ নেই। একটু আধটু পংক্তি সাজানো ছন্দব্যায়াম শিখেই কবিরা বই প্রকাশ করে বসেন। ফলে দু-চার-পাঁচ খানা কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গেছে মুদ্রণ সাফল্যে দীপ্ত এমন বহু কবির লেখাই নষ্ট শ্রমের এবং ততোধিক কষ্টকর পাঠের ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। কোনদিন এর আগে লেখেননি, বা বলা ভাল কোনদিন এর আগে লেখা ছাপতে দেবার মতো উৎসাহে উন্মুখ হননি এই কবি যে কোন নতুন কবি যশোপ্রার্থীর কাছে এক বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করলেন। সব কবিতাই যে অনন্য হয়েছে একথা, বলা বাহুল্য, কখনই বলা যাবে না। কিন্তু এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় পাঠের অযোগ্য কবিতা একটাও এই গুচ্ছে নেই।

বোঝাই যায় ভিতরে ভিতরে অনেক দিন ধরেই দুর্গা দত্ত তৈরী হচ্ছিলেন এবং হয়তো আরো দীর্ঘকাল এই প্রস্তুতিপর্ব চলতো যদি না দৈবাৎ তাঁর

কয়েকটি কবিতা সম্পাদকের নজরে আসতো। অত্যন্ত লাজুক এবং প্রায় নির্বাক এই ছেলেটি নিজের সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করতে নারাজ। "বিভাব" সম্পাদকীয় দপ্তরে একদিন কয়েক ঘণ্টা দেখেও বাক্যনিস্পৃহ এই ছেলেটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই জন্মায় না। যেন বা বলার সবই সে লিখে দিয়েছে কবিতায়। তবে তার বন্ধুর মুখে শুনেছি এই ছেলেটি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, পাখিদের ভাষা লক্ষ্য করে। অরণ্যে, হঠাৎ বৃষ্টি এলে সেই নিসর্গসলিলকে মর্যাদা দেয় মাটিতে চীৎ আকাশমুখো হয়ে শুয়ে। চেহারাও সাঁওতালী যুবকের মতো বলিষ্ঠ ও বন্য লাবণ্যে স্নিগ্ধ।

বিষয়, আঙ্গিকে, অন্যপূর্ব কিছু লক্ষ্য করা গেল এই কবিতাগুচ্ছে তা বলবো না। একেবারে আনকোরা কবির কাছে হয়তো উচিতও নয় ততটা প্রত্যাশী হওয়া। কিন্তু প্রথম থেকেই যা লক্ষ্য করা যায় তা হলো ঋজু প্রায় যথাযথ মিতকথনদীপ্ত প্রকাশভঙ্গী। কি বলবো, কি করে বলবো এবং ঠিক কতটুকু বলবো এই পরম ঈর্ষণীয় গুণাবলী সুরুতেই লক্ষ্য করা গেল। লক্ষ্য করা গেল এইসব সিদ্ধ-সৌন্দর্য্যের আড়ালেও কিছু গভীর পরমা ইঙ্গিত রয়েছে এই কবিতাগুচ্ছে যা দ্বিধাহীন ভাবে এই প্রকৃত কবির ভবিষ্যতের অধিকতর উজ্জ্বল প্রতিকৃতির সম্ভাবনা সূচিত করে।

এই কবিতাগুচ্ছের প্রায় অধিকাংশ কবিতারই উদ্ধৃতিযোগ্যতা রয়েছে তাই আলাদাভাবে কবিতা বা কবিতার কোনো পংক্তি উদ্ধৃত হলো না। এই প্রতি-বেদকের স্থির বিশ্বাস পাঠক প্রথম কবিতা পাঠেই উদ্বুদ্ধ হবেন শেষ কবিতার প্রান্তে পৌঁছোতে। ভালো কবিতা লেখা কঠিন, ভালো কবিকে সূচনাতেই সনাক্ত করা আরো কঠিন। এই আলোচকের সেই বিষয়ে যে খুব একটা দৈব ক্ষমতা আছে তেমন দাবী নেই। তবু বাংলা কবিতার মনস্ক পাঠক হিসাবে গত তিন দশকের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এই সম্পূর্ণ নতুন কবির কাব্যরচনার ক্ষমতা ও প্রকাশের সম্পূর্ণতা আমাকে তাজ্জব করেছে।

দুর্গা দত্ত'র এগারোটি কবিতা

ঘর

ভ্রষ্ট হাতে ভেঙে যায় ব্রত আর গানের ভূমিকা।
তুষের কাঠামো, রক্ত পথে পথে ঝরে গ্যাছে নষ্টকথামালা
অবুঝ দেহাতি আমি ছুঁতে চাই ধানের আশ্বাস
ফালের নির্ভর চাই আমাদের স্বপ্নময় কৃষিতৎপরতায়।
করতাল জেগে ওঠে, ডেকে তোলে সন্ধ্যার কীর্তন
অন্ধকারে ধ্বনিগুলি গূঢ় হয়ে কেঁপে ওঠে জলের সীমায়
তবু আমার নিজের দিকে এর আলো জ্বলে উঠে ঘিরেছে যখন
উঠোনের মায়া আর ধ্বস্ত অথর্ব খুব আমার নন্দন
দেখি সাজানো রয়েছে, দেখি

তুষের কাঠামো, ভাঙা খিলানে সুন্দর মৃত্যুলতা।

মুখ

জলের রেখায় আঁকা দৃশ্যমান পথঘাট যতদূর ছাখা যায় ছাখে
গোচারণ সহজতা চিহ্ন ফেলে গ্যাছে ঘাসে ধুলায় ধুলায়
কাক ও শকুন খুব দূর থেকে উড়ে উড়ে খুঁজে নেয় ভাগাড়ের মাটি—
হাড়ের পুঞ্জের দিকে জেগে ওঠে তৃষাতুর জলীয় স্বপ্নের দিনরাত।
হাড়ের হিসাব থেকে ফিরে আসে অশরীরী প্রাচীন আঙুল
জলপ্রপাতের শব্দে ভেসে আসে ডুবে থাকা বাথানের গান, আজ
ধুলায় ধুলায় ঢাকা মৃত ছাপগুলি চেয়ে ছাখে, আর ভাবে

হারিয়ে গিয়েছে কবে ধানের আঁচলে আঁকা মুখ !

ধ্বস

ছিল, একদিন। আজ নেই, পালকের স্তূপগুলি ঢেকে দিয়ে গেছে সব রাত
নদীর ছায়ার মতো কখনো অলীক হয়ে উঠে এসে ভেঙে গিয়েছিল
আমাদের প্রণামের ধারা, আকাশে তখনও ছিল মেঘ যেন
প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনহীন যখন তখন এসে ধুয়ে দিতে পারে সব হাত।
বিপুল আকৃতিময় হেঁটে যাওয়া ছিল সেইদিন, অন্ধকারে বাতাসে ও ত্রাসে
আজ শুধু দেখা যায় ছিন্ন পালকের পাশে রক্তমাখা ক্ষতস্থানগুলি

আঠারো দিনের শেষে যেভাবে পিছন ফিরে দেখে নেয় জন্মান্ধ জনক।

লোককথা

ভোররাতে রোজ তাকে ডেকে যায় জলের পাখীরা

যাব যাব ভাবে, কিন্তু কি করে বা যাবে !
তার সমস্ত শরীরময় বিষের উজ্জ্বলে ঢেকে জড়িয়ে আছে যে নীলসাপ !

আমি তাকে দিনরাত চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখেছি।
ছাখে : হাত নেই পা নেই অনড় অথর্ব খঞ্জ
অন্ধ আতুরতা
লাল নীল শাদা কালো হলুদ বাদামী—
ছাখে : পুণ্যকল্যাণ ভেবে ভীষণ ধ্বংসের দিকে বোধহীন বসেছে সবাই
দেখেছে শরীরমন ক্ষুধা তৃষ্ণা উপাসনা ত্রাণ ও প্রণাম
পদ্ম থেকে সরে গিয়ে কখন যে সাপকেই জড়িয়ে নিয়েছে

ছাখে আর ভয়ে ভয়ে কাঁপে, মনে পড়ে :
দূর গাঁয়ে থাকাকালে মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে
ভোররাতে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে বলেছিল—সাপ !!!
—আর তার বুক চেপে গেঁথে থাকা অন্য এক ছবি

গ্রামদেবতার থানে উপাসনা ভেঙে দিয়ে জ্বলে ওঠা যজ্ঞ : আত্মাহুতি।

উত্তর-বর্ষার গান—১

চূর্ণ বৃষ্টির বিভা ঢেকেছিল তোমার মণ্ডল
অরণ্য খাদের দিকে ভেসে ওঠা কুয়াশার মুখ
সবাই দেখেছে যারা
সৌজুত্রিতের গান গেয়ে নিয়ে প্রান্তরপ্রবাহে
নদীকে ডেকেছে
পিশাচসাধনমন্ত্র : ঘিরে বসে আমাদের আগুন জ্বালানো
আমরা ডাকি নি, শুধু মুখ আর হাত আর হাড়ের উল্লাসে
রাত্রিকে জটিল করে বেঘোরে নেচেছি

জলপ্রপাতের শব্দ ফিরে গেছে অরণ্য উৎসবে
বাতাসে তৃষ্ণার জিভ, কার জলে ভর করে যাবে!
দু পাশে প্রান্তর আর
কাঠের পুতুল হয়ে রাত্রিযাপন করে আমাদের দল।

মাতাল

মাটির ভেতর দিকে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মানুষ মাতাল
ওপরে হাওয়ায় ভাসে ক্ষমাশীল শিশিরের কণা : জাগরণ
পেছনে শরীর ভ্রষ্ট, হারবারের পাপ মোছে ঢেউ
আমরা সবাই তবু জেগে আছি হাড়ের মর্মরে।
মাতালমানুষ আজও খুঁজে ফেরে নীল আলো, গান
পাথরে পাথরে যার শেকড়ের ছায়া : সম্ভাবনা
মৃত্যুর কাজল চোখে ধীর হয়ে শান্ত হয়ে বসে
চিহ্নায় নেশার মদ তার স্মৃতি তার সার্থকতা।
ধ্বনিময় মুখ থেকে প্রাত্যহিক চেনাশোনা মুছে
খুলে ফ্যালে রক্তমেদ, তুলে আনে করোটি, কঙ্কাল
মানুষই গভীরতর দুঃখ কষ্ট নষ্ট পাপ ঘৃণা—
বুঝে নিয়ে থেমে যায় অন্ধকারকে আরও অন্ধ ক'রে, তবু তাকে
তান্ত্রিক বলে না লোকে, লোকে বলে অবুঝ মাতাল।

দূরের একজন

অঞ্জনার তীর দিয়ে যেন কেউ হেঁটে যায়
একা একা
আঁচল আড়ালে নিয়ে বাটি ;
সোয়াস্তি পুন্নার নয় সিদ্ধার্থ বা সুজাতারও নয় শুধু
নালকের মনে হয়েছিল যেন
সজলদিনের আভা মেখে নিয়ে কাছাকাছি শুয়ে আছে মেঘ
জেগে আছে স্মৃতি ও আরতি পাশাপাশি।

বিদায়

হাত থেকে খসে গেছে ধান, গরুর গাড়ির ভাঙা পথ
কাঁকরে কাদায় মৃত শুয়ে আছে অরণ্যের দিকে
উড়ে আসে খড় আর ভেসে ওঠে মুহূর্ত : শুশুক
ভীষণ শূন্যের গর্ভে নেমে যায় ভূতুড়ে মানুষ

ওপরে থাকার কথা তারও মনে ছিল একদিন
আগমনী গান শুনে পায়ের পাতায় ছিল স্রোত
একা দুপুরের পথে আজ তার ছায়াও হাঁটে না
তার চারপাশে ছড়ানো রয়েছে ফুল নয় : কাঠ

পারস্পরিক

হয়তো বা দিন ছিল স্রোতাভিমুখীন
তবু কেন সেই পথে খোয়া গেল রঙীন পালক!
জলের গভীর থেকে আজও কেন কুড়োতে পারিনি সেই অমল ঝিনুক
শুধু ভেঙে ভেঙে পড়েছি গহ্বরে।
অথচ পাথর নয় জল নয় ইট কাঠ কোনো কিছু নয়
মানুষের মতো আমি হেঁটে গেছি আভূমি বিনয়ে

পথ ও প্রান্তর ভেঙে কেঁপেছে বকুল
লেবুফুলে দুলেছে বিষাদ—
হয়তো জানিনি কেন কোনদিন কতখানি স্রোতাভিমুখীন
অথবা জানে না স্রোত
কতটা পাথর ভেঙে নেচে-কেঁদে কতদূর গেলে
কতখানি নদী হতে হয়।

অনুষঙ্গে সমুদ্র, শরীর

খোলো, যেদিকে ইচ্ছে হয় খোলো
অমলবৃষ্টির ধারা ধুয়ে দিক ঘর ও শরীর
ভেঙে যায় জলবিম্ব
ফেনাগুলি স্থির হয়ে থেকে ছুঁতে চায় শরীরের মায়া,
যেন কেউ জলের ভিতরে শুয়ে গড়ে নিতে চেয়েছিল জলের শরীর।

ফেনার আদলে ছিল ইচ্ছেগুলি মিলেমিশে গাঢ়তর হয়ে
তলায় তলায় ছিল টান, মেঘ ঝুঁকে পড়েছিল জলের কিনারে

ডাঙার ও'পারে শুধু দেখা যায় একাকার হয়ে আছে
শহর সমাধি গ্রাম
অরণ্য প্রান্তর।
যখন যেদিকে ইচ্ছে খোলো আর
ক্রমশ পশ্চিমদিকে চলে যেতে যেতে শুধু মনে রেখো
তোমার বৃষ্টির রেণু আবরণ করে এক সকালবেলায়
কেউ উঠে এসেছিল বসেছিল
সমুদ্রের খুব কাছাকাছি

উত্তর বর্ষার গান-২

কুয়াশাপাতায় ঢাকা আমাদের মুখ থেকে ঝরে পড়ে হিম
আজ মনে পড়ে শুধু দূরের আশ্বিন
একদিন আমাদেরও ছিল, তার মুক্তমেলার প্রতীপতা
যাবতীয় কথা আর বেঁচে থাকা তারও সঞ্জীবতা
স্বপ্নযাপনের দিকে লঘু চালে আচ্ছন্ন করেছে।
লোককথা অনুসারে আমি দ্রুত সরে গেছি স্বপ্নের বলয়ে
যেন কিছু অবান্তর, যেন কিছু শোভন গরিমা
নিজেকে মাথাতে চাই, বোঝা চাই
কতটা সূর্যাস্ত নামে প্রশ্নভারাতুর সন্ধ্যাবেলায়।

মনে পড়ে আজ এই মধ্যশীতের দিকে পথে।

যাওয়া ছিল ঠিকঠাক,
শরীরে শরীরে ছিল ছায়াময় বৃষ্টিকাতরতা, তবু
সমুদ্র ঢেউয়ের চূড়ায় কেঁপে-ওঠা আমাদের ভ্রূণ
দীর্ঘ প্রণিপাতে শুধু শ্রদ্ধেয় করেছে
ভালোবেসে বিশ্রস্ত করেনি।

আজ মনে পড়ে
তোমার দক্ষিণ হস্তে প্রসারিত জলের মহিমা
ব্যক্তিগত দেশকালে কতখানি শেকড়সন্ধানী—
আমাদের ঋতুচক্রে তোমার সমস্ত জল ঝরানো দরকার
যখনি ভেবেছি দেখেছি
বিগত আশ্বিন থেকে উড়ে এসে পাখি নয়
পাখির মতন কিছু সমুদ্রচূড়ার দিকে চলে গেছে
ধ্বংস কত স্বাভাবিক এই তথ্য বোঝাতে বোঝাতে।

সম্পাদকীয়

এক অদ্ভুত দেশে আমরা বাস করছি। আসাম আসামীদের, পাঞ্জাব অহিন্দু শিখদের, এরপর দেখা যাক আর কারা এ ধরণের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসেন! রোজ সকালের সংবাদপত্রে পাঞ্জাবের খেয়াল খুশীর পাঁচমেশালী হত্যার খবর থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পাণ্ডা পাণ্ডে সাহেব ও পুলিশ জরুরী সভায় বসে যান। পরদিন একই ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়, কখনো বা অধিকতর নৃশংস অহেতু হত্যা সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। না, কেন্দ্রে কোনো সরকার আছে বলে মনে হয় না। ধর্মস্থানে ধর্মগ্রন্থের পাশে ক্রমশই জমে ওঠা আগ্নেয় অস্ত্রের ভীড় কমাতে সরকারের অনেক কিছু বাড়ানো উচিত। এবং তা তারা জানেন না তাও নয়! মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো সত্যিই কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধির কারণে পাঞ্জাবকে মগের মল্লুক বানিয়ে এই সমস্যাটিকে জীইয়ে রাখা হয়েছে।

বৌদ্ধ জাতকে পড়েছি ভারতবর্ষ চিরকালই অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য, কবির এই বাণী ভারতবর্ষে কখনো সত্য হয়ে ওঠেনি, একমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময়কালীন ব্যতিক্রম ছাড়া! জাতক বর্ণিত সময়ই কি অন্য মুখোশে ফিরে আসছে। যে দেশে কয়েকশ কিলোমিটারের পরই ভাষা, খাদ্য-অভ্যাস, পরিচ্ছদ এমনকি দেবতাও পাল্টে যায়, সেই সুবিশাল মহাদেশকে এক অখণ্ড ভারতীয়তায় ধরে রাখতে যে সুদৃঢ় সৎ ও নিবেদিত নেতৃত্বের প্রয়োজন, বলা বাহুল্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কোনো নেতারই সেই গুণ ছিল না বা নেই।

দেশের এক বিশেষ অংশের লোক দিনের পর দিন যা-ইচ্ছে-তাই করে চলবে আর বিষণ্ণ সংবাদ হিসেবে আমরা তা রোজই পড়ে যাবো এ চলতে পারে না, অন্তত চলতে দেওয়া উচিত নয়। যে কোনো দাবী, যদি তাতে সত্যিকারের যুক্তি থাকে সরকারের তা অবিলম্বে মেটানো উচিত। এককালে ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম-ভারত সহ ভারতের আরো কয়েকটি অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এখন এই পাঞ্জাবের মূল রাজনৈতিক দাবীকে ধর্মের বর্ম দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে। ধর্মের কারণেই একদা দেশ ভাগ হয়েছিল। পাঞ্জাব কি সেই পরিণতির দিকেই এগুচ্ছে! সাংবাদিক, কবি, হত্যার এই হটকারী উৎসবে কেউই বাদ পড়ছে না।

নিজেদের অভ্যন্তরীণ কলহে ক্রমে নিজেরাই দুর্বল ও নষ্ট হয়ে যাবে এই ধৃষ্ট ধারণা সর্বত্রই সফল হবে এই আশা বাতুলতা। সরকার অবিলম্বে দৃঢ় হাতে এই সমস্যার মোকাবিলা না করলে সারা ভারতে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। দিয়েছেও।

বিভাবের "আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য সংখ্যা"র সাফল্যে আমরা অভিভূত। পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অসংখ্য চিঠির উত্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিবেদন এই যে আমাদের দপ্তরে এই সংখ্যা আর নেই। তবে গ্রন্থ হিসাবেও বর্ধিত আকার এটি প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে প্রয়োজনবোধে সংগ্রহ করে নেওয়া যেতে পারবে।

পরিশেষে বিভাবের গ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক ও বিজ্ঞাপণদাতাদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

BIVAV

Price Rs. 5.00 | January—March '84 | Regd. No.

Vol. 7 No. 2 | Published in May '84 | RN 30017/76.